অষ্টম সংখ্যা | জুন ২০১৭

বিজ্ঞান পত্রিকা

পদার্থবিদ্যার কিছু বিস্ময়

সুপারনোভা: তারাদের শেষজীবনের কাহিনী

দৈনন্দিন জীবনে রসায়ন

সাবান : জলে তাজা মাথা, তেলে তাজা লেজা

কিছু ইতিহাস

লিসা মাইটনার : মানবতাবাদী এক পদার্থবিজ্ঞানী

'বিজ্ঞান' (www.bigyan.org.in) –
এর কিছু বাছাই লেখার সংকলন

অষ্টম সংখ্যা | জুন ২০১৭

www.bigyan.org.in-এর বাছাই করা লেখার সংকলন

‘বিজ্ঞান’ সম্বন্ধে জানতেঃ

ওয়েবসাইট - www.bigyan.org.in
ফেসবুকের পাতা - https://www.facebook.com/bigyan.org.in

ইমেইল - bigyan.org.in@gmail.com

সূচীপত্র

সাবান : জলে তাজা মাথা, তেলে তাজা লেজা ০৬
শৃণ্বন্তু পাল

ময়লা আসলে কি? সাবান জল দিয়ে ধুলে আমাদের জামা-কাপড় কেন পরিষ্কার হয়? ময়লা, সাবান এবং জলের আণবিক স্তরের গল্প পড়ুন শৃণ্বন্তু পালের কলমে।

সুপারনোভা: তারাদের শেষজীবনের কাহিনী ০৯
সায়ন চক্রবর্তী

তারারা জ্বলে কেন? কি ঘটে তাদের মধ্যে? আর সেই ঘটনা কি অনন্তকাল ধরে চলতে পারে? না হলে, কোথায় গিয়ে শেষ হয়? সেই সব গল্প আমরা শুনবো হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়ন চক্রবর্তীর মুখে। সায়নের গবেষণার বিষয়ই হলো তারাদের শেষ পরিণতি নিয়ে নানা রহস্য উদঘাটন করা।

লিসা মাইটনার : মানবতাবাদী এক পদার্থবিজ্ঞানী ৩২
সেরজিও পি. পেরেজ

বাংলায় অনুবাদ শ্রীনন্দা ঘোষ

বিংশ শতকের প্রথমার্ধে পদার্থবিদ্যায় যে অসাধারণ অগ্রগতি ঘটেছিলো তার অন্যতম পুরোধা ছিলেন নিউক্লিয়ার বিভাজনের (nuclear fission) আবিষ্কর্তা লিসা মাইটনার। অথচ মহিলা ও ইহুদী হওয়ার কারণে প্রায় সবক্ষেত্রেই তাঁর কপালে জুটেছিল কেবলমাত্র বঞ্চনা। এতো প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র জানার ইচ্ছেকে অবলম্বন করে যে অসাধারণ সব কাজ তিনি করে গিয়েছেন, তারই গল্প বলছেন ইম্পেরিয়াল কলেজ অফ লন্ডনের গবেষক সেরজিও পি. পেরেজ। ‘বিজ্ঞান’-এর জন্য বাংলায় অনুবাদ করেছেন শ্রীনন্দা ঘোষ।

সম্পাদকীয়

প্রায় সাড়ে তিন বছর আগে ‘বিজ্ঞান’-এর যাত্রা শুরু হয়েছিল বাংলা ভাষায় উন্নতমানের সহজবোধ্য বিজ্ঞানের প্রবন্ধের অভাব কিছুটা দূর করার আশা নিয়ে। কয়েকজনের প্রচেষ্টায় এই উদ্যোগের শুরু, তারপর চলার পথের সাথী হয়েছে বিশ্বের নানা গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বহু বাঙালী বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানপ্রেমী। আমরা পেয়েছি অসাধারণ কিছু লেখা, উৎসাহিত হয়েছি বহু পাঠকের শুভেচ্ছায়, আর ‘বিজ্ঞান’ এগিয়ে চলেছে বাংলা ভাষায় এক অভূতপূর্ব উদ্যোগের নিদর্শন হয়ে।

বিজ্ঞানের ধর্ম প্রশ্ন করা। আত্মসমালোচনার মাধ্যমেই বিজ্ঞানের উন্নতি সম্ভব। ‘বিজ্ঞান’-এর প্রতিষ্ঠার মূলে যে প্রশ্নগুলো ছিল সেগুলো আমাদের নিরন্তর ভাবায়। ‘বিজ্ঞান পত্রিকা’-র অষ্টম সংখ্যা প্রকাশের মুহূর্তে সেই ভাবনাগুলো নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

‘বিজ্ঞান’ একটি পপুলার সায়েন্সের পত্রিকা। কিন্তু প্রশ্ন হল বিজ্ঞানের আদর্শ পাঠক কে? অর্থাৎ, আমরা কাদের জন্য লিখছি? ‘বিজ্ঞান’-এর লেখাগুলো সম্পাদনা করতে গিয়ে আমরা যেটুকু নিজেদের বুঝেছি তা তুলে ধরছি এখানে। পাঠক সহমত কিনা জানাবেন।

বিজ্ঞানের জগতের নতুন আবিষ্কারের কথা বাংলা খবরের কাগজে ছাপা হয়। যেমন, কিছুদিন আগে বিজ্ঞানীরা প্রথম মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরতে পারল তাদের যন্ত্রে। একশো তিরিশ কোটি বছর আগে দুটি বিশালাকার ব্ল্যাক-হোলের মিলনের ফলে ‘স্থান-কালের চাদরে’ যে কম্পন তৈরি হয়েছিল তা এতদিন বাদে এসে আছড়ে পড়ল মানুষের বানানো কলে। বিশ্বের বহু খবর কাগজের মত বাংলা কাগজেও সে নিয়ে বহু লেখা দেখলাম। একই ভাবে যখন ক্যান্সার গবেষণা বা জীন প্রযুক্তির যুগান্তকারী কিছু আবিষ্কার হয় সেগুলো সঙ্গে সঙ্গে এসে যায় বহুল প্রচলিত খবরের কাগজে। যারা গবেষণার সাথে যুক্ত নন এই নতুন আবিষ্কারের খবর পড়ে উদ্দীপিত হন। এই খবর ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য খবরের কাগজে বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বহু লেখায় ব্যবহৃত হয় সহজ উপমা ও অলঙ্কার। অনেক সময়ই এতে লেখাটি সত্যভ্রষ্ট হয়। কিন্তু, তাও সমাজে বিজ্ঞান সম্বন্ধে আগ্রহ ছড়িয়ে দেয় বলে খবরের কাগজের বিজ্ঞান বিভাগের লেখাগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের আলোচনার মাঝে কখনো জায়গা করে নেয় বিজ্ঞান জগতের খবর, এটা আনন্দের কথা। ‘বিজ্ঞান’-এও আমরা নতুন আবিষ্কারের কথা লিখি, তবে প্রচলিত খবরের কাগজের সাথে ‘কে আগে খবর পরিবেশন করবে’ এই প্রতিযোগিতায় আমাদের আগ্রহ নেই। আমাদের উদ্দেশ্য সেই আবিষ্কারের গভীরে যাওয়া। আমাদের ধারণা, খবরের কাগজের চটজলদি লেখা আর গবেষণা পত্রের টেকনিক্যাল লেখার মাঝামাঝি প্রবন্ধের বিশেষ অভাব রয়েছে আমাদের মাতৃভাষায়।

এক উৎসাহী পাঠকের কথা ভাবা যাক। সে হয়ত হাই স্কুল শেষের পথে। মনের মধ্যে নানা বিষয় সম্বন্ধে আগ্রহ। রাতের তারাভরা আকাশ তার কৌতূহল জাগিয়ে দেয়। খবরের কাগজে পড়ে সে জানল, মহাকর্ষীয় তরঙ্গ আবিষ্কৃত হয়েছে। সারা বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে হৈ চৈ। কিন্তু, আইনস্টাইন, ব্ল্যাক-হোল, মহাবিশ্বের আদি শব্দ - ইত্যাদি কিছু শব্দবন্ধ পড়ে তার আগ্রহ মিটছে না। সে আরও জানতে চাইছে। এই আবিষ্কারের পিছনে মূল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিটা ধরতে চাইছে। ঠিক যেমন চাইছে ক্যান্সার ঠিক কী জিনিস সেটা জানতে। কেন ক্যান্সার প্রতিরোধ করা শক্ত সেই জায়গাটা বুঝতে চাইছে। এইরকম এক পাঠকের জন্য বাংলা ভাষায় লেখা প্রবন্ধ কোথায়? আমাদের ধারণা বাংলা পপুলার বিজ্ঞানের জগতে ‘বিজ্ঞান’ এই অভাবটা খানিক পূর্ণ করছে। ‘বিজ্ঞান’-এর বেশিরভাগ লেখার লেখক সেই বিষয়ে গবেষণা করেন, বা অনেক ভাবনা চিন্তা করেছেন। তাই

তাদের লেখা পাঠককে বিষয়ের গভীরে নিয়ে যায়, অথচ সহজ করে বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত উপমা লেখার সত্যতাও নষ্ট করে না। সহজকরে সঠিক জিনিস বলার কাজটা কঠিন। তার জন্যেই আমাদের পরিশ্রম।

তার মানে এই নয় যে, 'বিজ্ঞান'-এর লেখা পড়তে হলে আগে থেকে সেই বিষয়ে উৎসাহী হতেই হবে। লেখাগুলোর সম্পাদনার সময় একজন সম্পাদকের কাজ হল দেখা যে লেখাটি পড়ে অন্তত তার মূল বিষয়টা বেশিরভাগ পাঠক ধরতে পারেন। 'বিজ্ঞান'-এর মধ্যে বহু ধরণের লেখা আছে। কিছু লেখা তুলনামূলকভাবে সহজ - বেশিরভাগ পাঠক একটানে পড়তে পারবেন, আবার কিছু লেখা সেই বিষয়ের বেশ গভীরে গিয়ে আলোচনা করেছে - উৎসাহিত পাঠকের কাছে এমন প্রবন্ধ বাংলা কেন যে কোন ভাষাতেই দুর্লভ।

'বিজ্ঞান'-এ প্রকাশিত লেখার সংকলন 'বিজ্ঞান পত্রিকা'-র এইবারের সংখ্যাটির জন্য আমরা তিনটি লেখা বাছাই করেছি। 'বিজ্ঞান'-এ আমরা যে বিভিন্ন ধরণের লেখা প্রকাশ করি বিভিন্ন পাঠককে মাথায় রেখে, এই তিনটি লেখা তার নিদর্শন।

বিজ্ঞানী লিসা মাইটনারের উপর লেখাটি সহজপাঠ্য। ইউরোপে বিশ্বযুদ্ধের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে মহিলা ও ইহুদী এই বিজ্ঞানীর সংগ্রাম পাঠককে অনুপ্রাণিত করবে। লিসা মাইটনারের গবেষণার প্রসঙ্গ এখানে এসেছে অবশ্যই, কিন্তু এই লেখাটির মধ্যে যে বিষয়টি ফুটে উঠেছে তা হল - "লিসা মাইটনার: এক পদার্থবিজ্ঞানী যিনি কখনো তাঁর মনুষ্যত্ব হারান নি।"

'সাবান' এর উপর লেখাটি সহজবোধ্য রসায়নের লেখা। প্রশ্ন হল, সাবান কীভাবে ময়লা পরিষ্কার করে? লেখক, যে নিজে রসায়নের গবেষক, সহজ ভাষায় সাবানের বিজ্ঞানের জায়গাটা তুলে ধরেছে। আশা করি পাঠকের, বিশেষত স্কুলে পড়া ছাত্রছাত্রীদের লেখাটি ভাল লাগবে।

এই সংখ্যার সবথেকে বড় লেখা হল সুপারনোভার উপর একটি সাক্ষাতকার। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষকের কাছ থেকে আমরা জানতে চেয়েছিলাম সুপারনোভা সম্বন্ধে। এই লেখাটি প্রকাশ করে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত, আর তার কারণ হল এই লেখাটিতে সহজ আলোচনার মাধ্যমে যে গভীরতায় পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে তা 'বিজ্ঞান'-এর অন্যতম লক্ষ্য। অনেক তারার জ্বালানী ফুরিয়ে এলে মৃত্যু হয় এক বিস্ফোরণের মাধ্যমে - সুপারনোভা সম্বন্ধে এই প্রচলিত খবর আমরা অনেকেই হয়ত জানি। কিন্তু, এই আলোচনাটিতে আমরা এক মুগ্ধ ছাত্রের মত জেনেছি তারারা কীভাবে বেঁচে থাকে, কীভাবে এত তাপমাত্রায় তাদের মধ্যে আলোও চলাচল করতে বাধা পায়, কীভাবে তাদের মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। আর কীভাবেই বা এতদূরে পৃথিবীতে বসে আমরা সেই মৃত্যুর খবর পাই। আরও উৎসাহিত হয়ে আমরা জানতে চেয়েছি কীভাবে একজন অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের গবেষক হওয়া যায়! এই লেখাটির মধ্যে আমরা ছুঁতে চেয়েছি অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের বেশ কিছু জটিল প্রশ্ন, কিন্তু পুরোটাই আড্ডার ছলে। আশা রাখি, অনুসন্ধিৎসু পাঠক লেখাটি পড়ে এই বিষয়ে গবেষণার আনন্দের জায়গাটা ধরতে পারবে।

সম্পাদকমণ্ডলী, 'বিজ্ঞান'
জুন ২০১৭

‘বিজ্ঞান’-এর সম্পাদনায় যারা আছি

- কুণাল চক্রবর্ত্তী (ন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস, ব্যাঙ্গালোর)
- কাজী রাজীবুল ইসলাম (ইনস্টিটিউট ফর কোয়ান্টাম কম্প্যুটিং, ওয়াটার্লু বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা)
- দিব্যজোতি ঘোষ (অ্যাডোবি, সান হোসে, ক্যালিফোর্ণিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় (ম্যাথওয়ার্কস, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- অর্ণব রুদ্র, সিনিয়র (NGO পদক্ষেপ ও ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- শাওন চক্রবর্তী (হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- শ্রীনন্দা ঘোষ (NGO পদক্ষেপ ও টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি ড্রেসডেন, জার্মানী)
- কাজী ফারহা ইয়াসমিন (আই বি এম, কলকাতা)
- আবির দাস (ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেটস, লোয়েল, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- সুমন্ত্র সরকার (ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- সূর্যকান্ত শাসমল (কগনিজেন্ট টেকনোলজি সলিউশনস, কলকাতা)
- নীলাঞ্জ চ্যাটার্জী (ইউনিভার্সিটি অফ অসলো, নরওয়ে)
- চিরঞ্জীব মুখার্জী (হরিশচন্দ্র রিসার্চ ইনস্টিটিউট, এলাহাবাদ)
- দীপ্যমান প্রামাণিক (হরিশচন্দ্র রিসার্চ ইনস্টিটিউট, এলাহাবাদ)
- ঝুমা সন্নিগ্রাহী (ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউট, ড্রেসডেন, জার্মানী)
- অমলেশ রায় (ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউট ফর কোল রিসার্চ, জার্মানী)
- কৌশিক ব্যানার্জী (ইনটেল, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- সুদীপ্ত ব্যানার্জী (NGO পদক্ষেপ ও এমপ্লয়ী বেনিফিট রিসার্চ ইনস্টিটিউট, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- শিলাদিত্য দেওয়াসি (NGO পদক্ষেপ ও কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ)
- অমিয় মাজি (পারডিউ ইউনিভার্সিটি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- অর্ণব রুদ্র, জুনিয়র (NGO পদক্ষেপ ও ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ডেভিস, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- ধ্রুবজ্যোতি সিনহা (আই. এম. আর. বি. ইন্টারন্যাশনাল, ক্যান্টার গ্রুপ)

এবং সহযোগিতা করছেন বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য বাঙালী বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান প্রেমী।

‘বিজ্ঞান পত্রিকা‘-র সম্পাদনা – শ্রীনন্দা, সূর্যকান্ত, নীলাঞ্জ, কুণাল, অর্ণব, অনির্বাণ, ধ্রুবজ্যোতি, ও রাজীবুল

প্রচ্ছদ ও পত্রিকার নকশা - সূর্যকান্ত

ইপাব পত্রিকা : নীলাঞ্জ

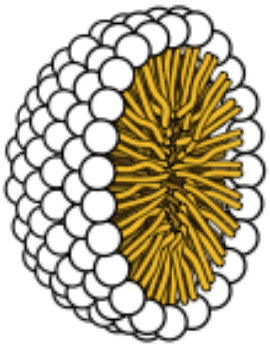

সাবান : জলে তাজা মাথা, তেলে তাজা লেজা

শৃণ্বন্তু পাল

বন জঙ্গল থেকে সুসভ্য সমাজে পদার্পণ করার সময় মানুষ অনেক কিছুই শিখেছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার ইচ্ছে তাদের মধ্যে অন্যতম। পরিষ্কার থাকলে রোগ হয় কম, মন মেজাজ থাকে তাজা । শরীর, চুল, জামাকাপড় এমনকি বাসনপত্র সাফ করার জন্য একটি প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত উপকরণ হল সাবান। এটা ঠিক, শ্যাম্পু কিম্বা ডিটারজেন্ট সাবান নয়, কিন্ত দুটি জিনিসের পিছনেই রসায়ন শাস্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অথচ সহজ তত্ত্ব লুকিয়ে আছে:

“Like dissolves like”

সাবান-ডিটারজেন্ট-শ্যাম্পু ইত্যাদি কেমন করে পরিষ্কার করতে সাহায্য করে, এটি বোঝার আগে বুঝতে হবে ময়লা কি। আর বুঝতে হবে ময়লা নিজে থেকেই জলে গোলে না কেন। যদিও ময়লা জৈব (organic) এবং অজৈব (inorganic), দু’প্রকারেরই হতে পারে, আমরা গতানুগতিক ভাবে ময়লা বলতে যা বুঝি, তা জৈব এবং অজৈব পদার্থের মিশ্রণ। আমাদের দেহ (প্রোটিন, ফ্যাট), আমাদের কাপড় (সেলুলোজ), রান্নার তেল (ফ্যাট এবং ফ্যাটি অ্যাসিড), এ সবই জৈব পদার্থ দিয়ে তৈরী। এই জৈব উপাদানগুলির জলের প্রতি বিকর্ষণের (hydrophobic nature) জন্য শরীর-নিষ্কৃত বর্জ্যপদার্থ, কাপড়ে আটকে থাকা ময়লা, কিম্বা বাসনের গায়ে তেলচিটে দাগ প্রচণ্ড ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকে নিজেদের অবস্থান। অন্যদিকে খাঁটি অজৈব ‘ময়লা’, যেমন সোনালী বালি জলকে বিকর্ষণ করে না। তাই সোনালী বালি না ময়লা করে, না অপ্রয়োজনীয় ভাবে চিটে থাকে। ঝেড়ে দিলেই সাফ!

আণবিক স্তরে, জলের ময়লার প্রতি কিম্বা ময়লার জলের প্রতি আকর্ষণশক্তির চেয়ে উভয়ের নিজেদের প্রতি বেশি আকর্ষণশক্তি। তাই জলের অণু খুশি জলের অণুর সাথে, ময়লার অণু খুশি নিজের বা অন্য জৈব পদার্থের অণুর সাথে। জল দিয়ে ময়লা ধুয়ে ফেলতে হলে জলের সাথে ময়লার অণুর আকর্ষণ বাড়াতে হবে। সরাসরি ভাবে এই আকর্ষণ বাড়ানো কঠিন। তবে জলের অণুর নিজের প্রতি আকর্ষণ কমাতে পারলে পরোক্ষভাবে ময়লার প্রতি জলের আকর্ষণ শক্তি বাড়ানো যেতে পারে।

সাবান জাতীয় রাসায়নিক পদার্থগুলিকে সার্ফেকট্যান্ট (Surfactant) বলা হয়। এরা জলের নিজের অণুর প্রতি আকর্ষণ কমিয়ে দিতে পারে। সার্ফেকট্যান্ট নামের উৎপত্তি সারফেস অ্যাকটিভ এজেন্ট (surface active agent) থেকে। জলে সার্ফেকট্যান্ট গুললে জলের অণুর কমে আসা আকর্ষণের জন্য জলের পৃষ্ঠটান (surface tension) কমে যায়। একটি ছোট পরীক্ষা করে এটা প্রমাণ করা যায়। একটা কাচের গ্লাসে জল নিয়ে আস্তে করে একটি আলপিন জলের উপরে রাখলে পাশের ছবির মত আলপিনটা ভাসতে থাকে । এখন এই পরীক্ষাটি যদি সাবানগোলা জলে করা হয়, তাহলে অনেক কষ্ট করেও আলপিনটাকে ভাসিয়ে রাখা যায় না। দ্বিতীয়

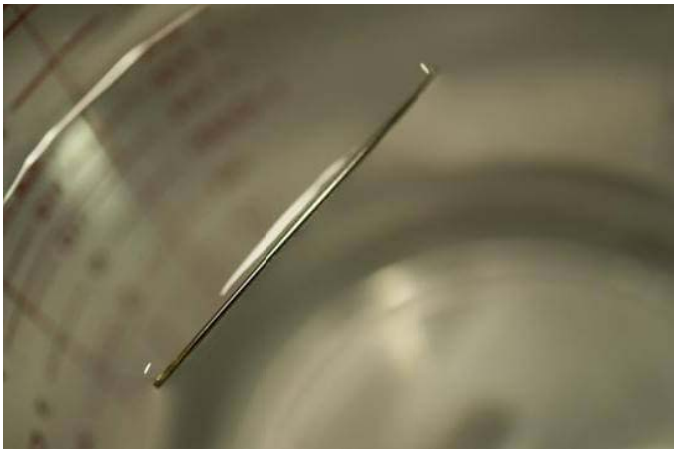

একটি আলপিন জলের উপরে রাখলে আলপিনটা ভাসতে থাকে

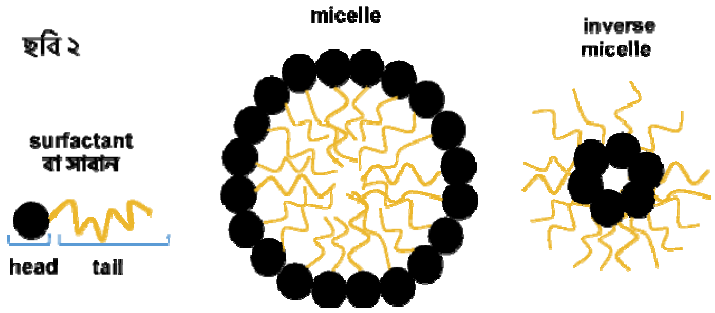

সাবান বা ডিটারজেন্টের আণবিক গঠন

ক্ষেত্রে জলের কমে যাওয়া পৃষ্ঠটান (surface tension) আলপিনের ওজন ঠেকাতে পারে না। ময়লার অণুগুলিকে এই আলপিনের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। সাবান বা ডিটারজেন্টগোলা জলে যেমন আলপিন আর ভাসতে পারে না, ঠিক তেমনি ময়লা আর জামাকাপড়কে আটকে ধরে রাখতে পারে না।

জলের এই পরিবর্তন আনার জন্য কতটা সাবান বা ডিটারজেন্ট প্রয়োজনীয়? এক বালতি জলে এক চামচ সাবান? নাকি এক মুঠো? নাকি এক কিলোগ্রাম? সাবান বা ডিটারজেন্টের আণবিক গঠনে একটি মিল আছে: এদের একটি মাথা , এবং একটি লেজ আছে, যেমন দেখানো হয়েছে ছবি ২-এর বাম দিকে। সাধারণত মাথাটা হাইড্রোফিলিক (hydrophilic), অর্থাৎ মাথাটার জলের অণুগুলির প্রতি আকর্ষণ প্রবল। লেজটা আবার হাইড্রোফোবিক (hydrophobic), অর্থাৎ লেজটা জলকে একেবারেই পছন্দ করে না। সাবান বা ডিটারজেন্টের কার্যক্ষমতা জলে তাদের ঘনত্বের (concentration) উপর নির্ভরশীল। সাবানের অণুর ঘনত্ব একটা বিশেষ ঘনত্বের (একে ক্রিটিকাল মাইসেল ঘনত্ব বা CMC বলা হয়) নিচে হলে, অণুগুলির মধ্যে মিথোক্রিয়া (interaction) না হওয়ায় অণুগুলি জলে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু ঘনত্ব CMC-র উপরে পৌঁছলেই দ্রুত এরা নিজেদেরকে গোলকাকারে সাজিয়ে নেয়। এই গোলকাকারের সৃজনকে বলে মাইসেল (micelle), যেমন দেখানো হয়েছে ছবি ২-এর মাঝখানে। এই মাইসেল এমন ভাবে তৈরী হয়, যাতে হাইড্রোফিলিক মাথাটা বাইরের দিকে,

অর্থাৎ জলের সংস্পর্শে থাকে। ফলে, হাইড্রোফোবিক লেজটি জলকে এড়িয়ে থাকতে সক্ষম হয়। আমরা সবাই জানি যে জল ও তেল একে অপরের সাথে মেশে না। অতএব, অনুমান করা যেতে পারে যা জলে মেশে না তা তেলে মিশবে। আবার যা তেলে মেশে না তা জলে মিশবে। কাজেই এই একই সাবান বা ডিটারজেন্ট তেলে গুললে, হাইড্রোফোবিক লেজটি বাইরের দিকে আর হাইড্রোফিলিক মাথাটা ভেতরের দিকে থাকে: তৈরী হয় যাকে বলে inverse micelle, যেমন দেখানো হয়েছে ছবি ২-এর ডানদিকে।

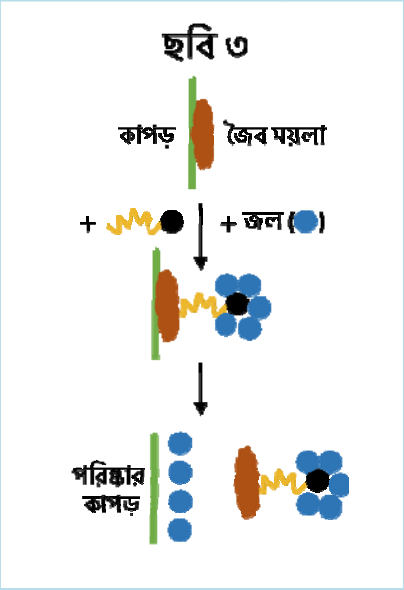

সাবান বা ডিটারজেন্টের এই দ্বৈত চরিত্রকে কাজে লাগিয়ে জল দিয়ে সহজেই বিভিন্ন জিনিস পরিষ্কার করা যায়। যেমন দেখানো হয়েছে ছবি ৩-এ, ধরা যাক একটা সুন্দর সবুজ জামায় চিটচিটে বাদামী রঙের জৈব ময়লা লেগে আছে । অনেক কষ্ট করেও শুধু জল দিয়ে তা ধুয়ে ফেলা যাচ্ছে না। এবার ধরা যাক জলে খানিক সাবান গুলে দেওয়া হল। এই ময়লার প্রতি জলে গোলা সাবানের অণুর লেজের আকর্ষণ প্রবল । তাই ময়লাটা সাবানের অণুর সাথে সহজেই আটকে যায়। অন্য দিকে জলের অণু আবার সাবানের অণুর মাথাকে আকর্ষণ করে। 'কান টানলে মাথা আসে', তাই জল সহজেই এই মাথায় 'টান মেরে' লেজে আটকে থাকা ময়লাকে কাপড় থেকে তুলে ফেলে। এরপর এই ময়লাগোলা জল ধুয়ে ফেললেই কাপড় এক্কেবারে সাফ!

সার্ফেকট্যান্ট শুধু ময়লা সাফ করতেই ব্যবহার হয় না। এই মাইসেলের মধ্যে এই সীমিত জায়গায় অনেক রকম রাসায়নিক পরিবর্তনও ঘটানো যায়। তবে সে গল্প বলব পরের বার!

লেখক পরিচিতি ('বিজ্ঞান'-এ প্রকাশিত হওয়ার সময়) :

লেখক টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্টডক্টরাল গবেষক। গবেষণার বিষয় অর্গানোমেটালিক কেমিস্ট্রি, বিশেষ করে ক্যাটালিসিস (অনুঘটন)। জওহরলাল নেহেরু সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড সাইন্টিফিক রিসার্চ থেকে করেছেন স্নাতকোত্তর এবং মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি.। গবেষণা ছাড়াও তাঁর শখ ভ্রমণ এবং ফটোগ্রাফি।

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন
http://bigyan.org.in/2016/05/09/soap/

লেখাটি 'বিজ্ঞান'-এ ৯ মে, ২০১৬ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রচ্ছদের ছবির উৎস :
https://en.wikipedia.org/wiki/Soap#/media/File:MicelleColor.png

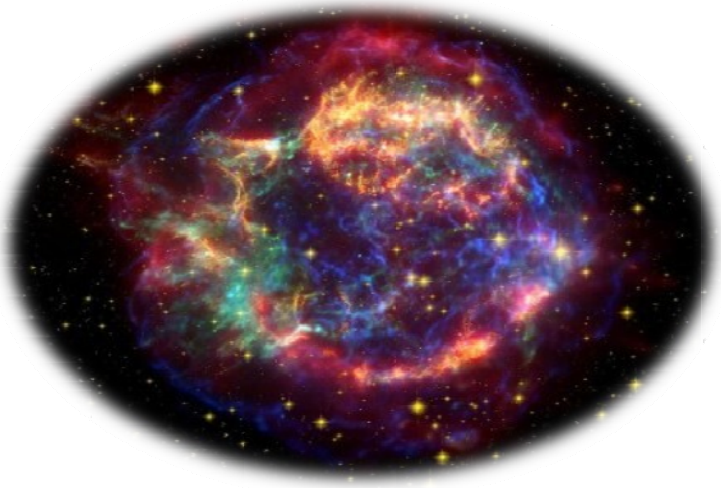

সুপারনোভা: তারাদের শেষজীবনের কাহিনী

সায়ন চক্রবর্তী

সায়ন চক্রবর্তী হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক। তার গবেষণার বিষয় অ্যাস্ট্রোফিসিক্স। সায়ন নিজের গবেষণার বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে খুবই উৎসাহী। 'বিজ্ঞান' -এর তরফ থেকে অনির্বাণ আর রাজীবুল এই উৎসাহের সুযোগ নিয়ে সায়নের সাথে এক বিকেলে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ক্লাসরুমে বসে তার গবেষণার খুঁটিনাটি জানার চেষ্টা করলো। নিমেষের মধ্যে ক্লাসরুমের মধ্যে থেকে তারা চলে গেল পৃথিবীর বাইরে, তারাদের দেশে। সেই ক্লাসে যা আলোচনা হলো আপনাদের সামনে সেটা তুলে ধরছি।

অনির্বাণ / রাজীবুল: তুমি তোমার কাজ সম্বন্ধে যদি একটু বলো।

সায়ন: আমার গবেষণার বিষয় অ্যাস্ট্রোফিসিক্স। বিশেষ করে সুপারনোভা নিয়ে আমার কাজ।

সুপারনোভা?

কিছু তারা, সূর্যের চেয়ে অনেক বড়, এরা একসময় মারা যায়। মারা যাওয়ার সময় একটা বিস্ফোরণ ঘটে, সেটাই সুপারনোভা। এই সুপারনোভার ফলে তারার ভিতরের জিনিস চতুর্দিকে ছিটকে যায় বিশাল গতিতে। এত গতিতে যে এক একটা কণা এক সেকেন্ডে পৃথিবীর এপার থেকে ওপার ছুটে যেতে পারে যেতে পারে।

আচ্ছা, তারা মরে যাওয়া মানে কি?

ভালো প্রশ্ন। তার আগে বুঝতে হবে, তারা বেঁচে থাকা মানে কি? তারারা বেঁচে থাকে নিউক্লিয়ার ফিউসনের ফলে। তারার যে আলো দেখি, তার শক্তির উৎস বেশির ভাগ সময় হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফিউসন।

নিউক্লিয়ার ফিউসনটা কি, সেটা কি ছোট্ট করে বলা যায়?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। এই মহাবিশ্ব বেশিরভাগটাই হাইড্রোজেন দিয়ে তৈরী। তারারাও তাই। হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াস তারাদের মধ্যে এদিক ওদিক ছুটে বেড়ায় আর মাঝে মাঝে একে অপরের সাথে ধাক্কা খায়। খুব তীব্র বেগে ধাক্কা খেলে এরা একে অপরের সাথে জুড়ে যেতে পারে। সংক্ষেপে, এটাই নিউক্লিয়ার ফিউসন।

এই নিউক্লিয়ার ফিউসন কি তারাদের মধ্যেই হতে হয়? ধরো, আমাদের বায়ুমন্ডলের মধ্যেও কি হতে পারে না এটা?

না। এর জন্য তাপমাত্রা আর নিউক্লিয়াসের ঘনত্ব অনেক অনেক বেশি হতে হবে। এই যে আমি এই চেয়ারটা ছুঁয়ে দেখছি, এই চেয়ারটা যে পরমাণু দিয়ে তৈরী, তার নিউক্লিয়াসগুলোকে কিন্তু আমি ছুঁই না। নিউক্লিয়াসের চারিদিকে যে ইলেক্ট্রনগুলো আছে, সেগুলো আমার হাতের ইলেক্ট্রনগুলোকে দূরে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করে। সেই বলটাই আমি অনুভব করছি ছুঁয়ে দেখার সময়। নিউক্লিয়াসগুলো বড়ই ছোট, আর এই ইলেক্ট্রনের ঘোমটার আড়ালে লুকিয়ে থাকে। কিন্তু একটা তারার মধ্যে এত তাপমাত্রা যে ইলেক্ট্রনগুলো নিউক্লিয়াস থেকে ছিঁড়ে যায় এবং নিউক্লিয়াসরা একা একা ঘুড়ে বেড়ায়। শুধু তাই নয়, তাপমাত্রা এত বেশি যে নিউক্লিয়াসরা একে অপরের সাথে সজোরে ধাক্কা খেয়ে জুড়ে যেতে পারে। তারার মধ্যেই তাই নিউক্লিয়ার ফিউসন সম্ভব।

মানুষও এই প্রক্রিয়া পৃথিবীতে নকল করতে পেরেছে। হাইড্রোজেন বোমায়। তবে নিয়ন্ত্রিত নিউক্লিয়ার ফিউসন মানুষ করতে পারেনি। নিয়ন্ত্রিত ফিউসনে যতটা শক্তি পাওয়া যায়, ততটা ঢালতে হয় না। অতএব নিট ফল হলো, শক্তি লাভ হচ্ছে। কিন্তু এখনো অব্দি শুধু শক্তি খরচা করে নিউক্লিয়ার ফিউসন করা গেছে।

তারাদের বেঁচে থাকা তার মানে ...

তারাদের বেঁচে থাকা এই নিউক্লিয়ার ফিউসনের ফলেই। তারাদের কোর বা কেন্দ্রস্থল যেখানে, সেখানে এত বেশি তাপমাত্রা আর নিউক্লিয়াসের ঘনত্ব যে এই নিউক্লিয়ার ফিউসন এখানে সফলভাবে হয়। এবং এই নিউক্লিয়ার ফিউসনের ফলে যে শক্তি বের হয়, সেই শক্তিই তারাটাকে জিইয়ে রাখে।

তাপমাত্রা ঠিক কত বেশি, সেটার একটা আইডিয়া পাওয়া যায় কি? এই ধরো, আমাদের চুল্লিগুলোর মধ্যে তাপমাত্রা কয়েক হাজার ডিগ্রী সেলসিয়াস। সেই তুলনায় কত?

সবচেয়ে কাছের তারা যেটা, সেটা হলো সূর্য। সূর্যের বাইরের দিকে যে তাপমাত্রা সেটা আমরা আন্দাজ করতে পারি সহজেই, সূর্যের রং দেখে। কোন জিনিসকে গরম করতে থাকলে প্রথমে সে লাল হয়ে ওঠে, তারপর ধীরে ধীরে হলুদ, এবং আরও শক্তি বাড়তে থাকলে নীলের দিকে যেতে থাকে। তো সূর্যের রং হলুদ। আবার টাংস্টেন

বাল্বের থেকে যে আলো বেরোয়, তার রং-ও হলুদ। তাহলে সূর্যের বাইরের দিকের তাপমাত্রা একটা টাংস্টেন বাল্বের থেকে বিশেষ আলাদা নয়। সেই থেকে সূর্যের উপরতলার তাপমাত্রা ৫-৬ হাজার কেলভিনের কাছাকাছি বলে আমরা অনুমান করতে পারি। কিন্তু ৫-৬ হাজার কেলভিনে নিউক্লিয়ার ফিউসন হয় না। তার জন্য আরও হাজার গুন বেশি তাপমাত্রার দরকার। সূর্যের ভিতরের তাপমাত্রা কয়েক কোটি কেলভিন অব্দি পৌঁছে যেতে পারে। এই নিউক্লিয়ার ফিউসন সেখানেই হয়।

সূর্যের বাইরের সাথে ভিতরের এই তফাত কেন?

এই নিউক্লিয়ার ফিউসনের ফলে যে শক্তি বেরোয়, সেটা প্রথমে গামা রশ্মি হিসেবে বেরোয়। কিন্ত সূর্যের বিশাল ঘনত্বের ফলে এইসব গামা রশ্মি আটকা পড়ে যায়। কম্পটন বিক্ষেপণের দ্বারা।

কম্পটন বিক্ষেপণটা কি?

খুব বেশি শক্তির একটা আলোককণা একটা ইলেক্ট্রনের সাথে ধাক্কা খেলে, মাঝেমাঝে তার শক্তিটা ইলেক্ট্রনকে দিয়ে দেয় আর নিজে অল্প শক্তির আলোককণা হয়ে বেরিয়ে যায়। এই অল্প শক্তির আলোককণাটি কিন্তু মূল উচ্চশক্তির কণাটি যেদিকে ছুটছিল, তার বদলে অন্য কোন দিকেও বেরোতে পারে। এই যে সূর্যের ভিতরে নিউক্লিয়ার ফিউসনের ফলে গামা রশ্মির আলোককণাগুলো তৈরী হলো, তারা সেই শক্তি নিয়ে সূর্য থেকে বেরোতে পারে না। সূর্যের ভিতরে থাকা ইলেক্ট্রনরা, যারা কিনা পরমাণুর ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে, তারা এই আলোককণাগুলোকে ধরে ফেলে। এই আলোককণাগুলো নিজেদের শক্তি আস্তে আস্তে এই ইলেক্ট্রনদের চালান করতে থাকে আর নিজেরা আঁকাবাঁকা পথে বেরোতে থাকে। একটা আলোককণার এইভাবে এঁকেবেঁকে সূর্যের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে প্রায় দশ হাজার বছর লেগে যেতে পারে।

আর ইলেক্ট্রনগুলোও এই আলোককণাদের গুঁতো খেতে খেতে গরম হয়ে যায়। আর এই গুঁতোগুঁতির ফলে সূর্যের ভিতরে একটা চাপ সৃষ্টি হয়। যেটা তারাদের দাঁড় করিয়ে রাখে তাঁদের মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে। এই চাপটা না থাকলে তাঁরারা চুপসে যেত।

এই করে তারারা নাহয় বেঁচে থাকলো। এটা আজীবন কাল ধরে হয় না কেন?

হ্যাঁ, তাহলে বোঝা গেল যে সবকিছুর মূলে ওই নিউক্লিয়ার ফিউসন। ফিউসন অনন্ত কাল ধরে হতে পারে না। হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস জুড়ে জুড়ে তৈরী হয় হিলিয়াম এবং একসময় এই হিলিয়ামের সাথে আরও কিছু জুড়ে কার্বন, অক্সিজেন ইত্যাদি তৈরী হয়। যত ফিউসন হয়, আরেকটু ভারী কোনো মৌল তৈরী হয় আর আরেকটু শক্তি নিংড়ে নেওয়া যায়। এই ফিউসন চলতে চলতে একসময় আয়রন (লোহা) তৈরী হয়। একবার আয়রন বানিয়ে ফেললে এই প্রক্রিয়াকে আর বেশিদূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না।

আরো ভারী মৌল তৈরী করা যায় না কেন ?

কারণ, আয়রনের নিউক্লিয়াস সবচেয়ে স্থায়ী নিউক্লিয়াস। তার থেকে ভারী নিউক্লিয়াস বানাতে গেলে, তাকে শক্তি দিতে হয়। শক্তি বের করা যায় না।

আর যে সে তারা আয়রন বানাতে পারে না। তাকে সূর্যের চেয়ে অন্তত আট দশ গুণ বড় হতে হয়। সেইরকম তারার মধ্যে তাপমাত্রা আর নিউক্লিয়াসের ঘনত্ব এত বেশি হয় যে সে আয়রন নিউক্লিয়াস অব্দি বানাতে পারে। আর এইভাবে তারার ভিতরে আয়রন নিউক্লিয়াসের একটা দলা তৈরী হয়।

আচ্ছা, দাঁড়াও একটু। এই হাইড্রোজেন থেকে আয়রন অব্দি যেতে যদি খালি শক্তি পাওয়াই যায়, দিতে হয়না, তাহলে তো এটা এমনি এমনি হওয়ার কথা। তাহলে বেশি তাপমাত্রা বা সাইজের প্রয়োজন কেন?

ব্যাপারটা এইভাবে ভাবো। হাইড্রোজেন একটা উঁচু জায়গায়। তার পর হিলিয়াম আরেকটু নিচু উপত্যকায়, তাই আরো স্থায়ী। সবশেষে আয়রন সবচেয়ে নিচু উপত্যকায়। কিন্তু একটা উপত্যকা থেকে আরেকটায় পড়তে হলে একটা পাহাড় টপকে তবে পড়তে হবে। এবার খুব বেশি জোরে এসে তবেই ওই পাহাড় টপকানো যায়। এমনিতে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ার সুযোগ নেই। আর অত জোরে এসে পাহাড় টপকানোর চেষ্টা একমাত্র খুব বেশি তাপমাত্রা আর নিউক্লিয়ার ঘনত্ব থাকলেই সম্ভব। কিন্তু আয়রনের পরে উপত্যকাগুলো আবার উঁচুর দিকে যেতে থাকে। তাই এরপর লম্ফঝম্প করেও শক্তি বার করার উপায় নেই। এই যে পাহাড় আর উপত্যকার উপমা দিলাম, এটাকে স্থিতিশক্তির ভূচিত্র (Potential energy landscape) বলতে পারি, যেখানে পাহাড়ের উচ্চতা বা উপত্যকার গভীরতা বিভিন্ন নিউক্লিয়াসের (ভূচিত্রে বিভিন্ন জায়গা) স্থিতিশক্তি নির্দেশ করে।

তো, আয়রনের একটা বল তৈরী হতে থাকে। আর সেই আয়রনের বলের টিকে থাকার উপায় সাধারণ তারার টিকে থাকার উপায়ের থেকে আলাদা। একটা সাধারণ তারা গ্যাসীয় অবস্থায় আছে। তাপমাত্রার ফলে তার ভিতর যে গুঁতোগুঁতি হতে থাকে, সেই চাপটাই তারাটাকে দাঁড় করিয়ে রাখে। কিন্তু এই আয়রনের বলটা আর শক্তি তৈরী করছে না। এ মাধ্যাকর্ষণের ফলে সঙ্কুচিত হতে শুরু করে। আর একে দাঁড় করিয়ে রাখে একটা আশ্চর্য রকমের চাপ, যাকে আমরা ফার্মি প্রেসার বলি।

ফার্মি প্রেসার কি?

এই আয়রনের বল দিয়েই বোঝাই। প্রত্যেকটা আয়রন নিউক্লিয়াসের সাথে কিছু ইলেক্ট্রন যুক্ত আছে। এই ইলেক্ট্রনরা ফার্মিয়ন। ফার্মিয়নদের বিশেষত্ব হলো, তারা এক স্টেট বা অবস্থায় থাকতে পছন্দ করে না। যেহেতু এক অবস্থায় থাকতে পছন্দ করে না, খুব বেশি কাছাকাছি চলে এলে এদের মধ্যে একটা চাপ সৃষ্টি হয়। এই চাপটাকেই বলে ফার্মি প্রেসার। এই চাপই তারার ভিতর ওই আয়রনের বলটাকে টিকিয়ে রাখে।

কিন্তু চিরকাল টিকিয়ে রাখতে পারে না। আজ থেকে প্রায় ৮০ বছর আগে, সুব্রহ্মণীয়ম চন্দ্রশেখর আবিষ্কার করেছিলেন যে এই ফার্মি প্রেসারের পক্ষে মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে আয়রনের বলটাকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব, কিন্তু একটা ভর (mass) অব্দি।

এটাই কি চন্দ্রশেখর লিমিট?

সেই ওজনটারই নাম চন্দ্রশেখর লিমিট। তারার ভিতরের আয়রনের দলা যখন বাড়তে বাড়তে ওই চন্দ্রশেখর লিমিটের কাছে পৌঁছে যায়, তখন আর তারা টিকতে পারে না।

এই চন্দ্রশেখর লিমিটটা কত?

সূর্যের ভরের দেড় গুণ মত। সংখ্যাটা নির্ভর করে দলাটা আয়রনের না হিলিয়ামের, কিন্তু এই লিমিটের থেকে বেশি ওজন আর ফার্মি প্রেসার দিয়ে টিকিয়ে রাখা যায়না।

ওজন না ঘনত্ব?

না, ওজন। আসলে ঘনত্ব থেকেই এই লিমিটটা বার করা হয়। তবে চন্দ্রশেখর একটা সম্পর্ক বার করেছিলেন তারার মাঝখানের ঘনত্ব আর তারার ওজনের মধ্যে। এর ফলে একটা সুবিধে হলো। একটা তারার গোটা ওজনটা বার করা খুব সোজা। তারার আশেপাশের জিনিসের উপর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব থেকে ওজন মাপা যায় নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের সূত্র ব্যবহার করে। ভিতরের ঘনত্বটাকে সরাসরি তো মাপা যায় না, তাই তারার ওজন মেপে চন্দ্রশেখর লিমিটের সাথে তুলনা করা সোজা। তাই লিমিটটাও একটা ওজন।

চন্দ্রশেখর লিমিটটা কি করে বার করে একটু ছোট্ট করে বলবে?

হ্যাঁ। যেটা বললাম, ইলেক্ট্রনরা ফার্মিয়ন। ওই আয়রনের দলার মধ্যে সব ইলেক্ট্রনগুলো এক শক্তিতে থাকতে পারেনা। ইলেকট্রনগুলোর সবচেয়ে বেশী যে শক্তি হয়, সেই শক্তিটাকে ফার্মি লেভেল বলে। এই ফার্মি লেভেলের মান যদি স্থির অবস্থায় ইলেক্ট্রনের ভরের থেকে বেশি হয়, তখন আইনস্টাইনের $E=mc^2$ অনুযায়ী শক্তি আর ভরের মধ্যে রূপান্তর হতে পারে, ইলেক্ট্রনগুলো রিলেটিভিস্টিক ইলেক্ট্রন হয়ে যায়। তখন আপেক্ষিকতাবাদ বা রিলেটিভিটিকে সম্পূর্ণ ব্যবহার করে তাঁদের অবস্থাকে বুঝতে হয়। এই রিলেটিভিস্টিক ইলেক্ট্রনগুলোকে সহজে সংকোচন করা যায় আর এখান থেকেই মোটামুটি মাধ্যাকর্ষণ ফার্মি প্রেসারকে ছাপিয়ে যায়। অতএব, মোদ্দা কথা, ওই লিমিটটা পেতে আয়রনের দলার মধ্যে ফার্মি লেভেলকে ইলেক্ট্রনের ভরের সমান করতে হয়। এই অঙ্কটাই চন্দ্রশেখর কষেছিলেন।

তো, চন্দ্রশেখর বুঝেছিলেন যে একটা লিমিটের পর মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে আর এই আয়রনের বলটাকে ধরে রাখা যায় না। এর সংকোচন শুরু হয়। কিন্তু সংকুচিত হতে হতে এই বলটার যে কি গতি হবে, সেটা চন্দ্রশেখর জানতেন না। সংকোচন হবে, ওই অব্দি তিনি বলেছিলেন।

১৯৩১-এ চন্দ্রশেখর এই অঙ্কটা কষলেন। ৩২-তে নিউট্রন আবিষ্কার হলো। ৩৪-এ ওয়াল্টার বাদে আর ফ্রিৎজ জুইকি বার করলেন যে এই বলটা সংকুচিত হতে হতে একটা নিউট্রনের বলে পরিণত হবে।

পরমাণুর বাকিরা গেল কোথায়? প্রোটন, ইলেক্ট্রন?

খুব বেশি ঘনত্বের ফলে আয়রন নিউক্লিয়াসগুলো ইলেক্ট্রনদের খুব কাছে পেয়ে যাবে। আর তাদের খেয়ে নিতে শুরু করবে। এই খেয়ে নেওয়া ল্যাবেও দেখা যায়, যাকে বলে K-ক্যাপচার প্রসেস। পরমাণুর মধ্যে ইলেক্ট্রনগুলো তো K, L, M এইসব কক্ষে নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ঘুরছে, K-টা সবচেয়ে কাছে। K-ক্যাপচার প্রসেসে, নিউক্লিয়াস K কক্ষের ইলেক্ট্রনগুলোকে খেয়ে নেয়। তো সেই K-ক্যাপচারের মতোই একটা প্রসেসে আয়রন নিউক্লিয়াসগুলো ইলেক্ট্রনগুলোকে খেতে শুরু করে। নিউক্লিয়াসের ভিতরে যে প্রোটনরা আছে, তারা ইলেক্ট্রনের সাথে মিলে নিউট্রনে পরিণত হয়।

এই পরিবর্তনটা ইলেকট্রো-উইক বলের মাধ্যমে হয়। এর জন্য একটা দাম দিতে হয়। সেটা হলো একটা নিউট্রিনো। এই নিউক্লিয়াসগুলো থেকে সেই নিউট্রিনোগুলো বেরোতে থাকে। তো, এইভাবে একটা নিউট্রনের গোলক তৈরী হলো। তাঁরার কেন্দ্রস্থলটা এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে যাকে বলে নিউট্রন স্টার ।

সাইজগুলো একটু দেখা যাক। চন্দ্রশেখর লিমিটে তারার মাঝখানের ওই আয়রনের গোলকের টিপিকাল সাইজ দশ হাজার কিলোমিটার। মানে পৃথিবীর সাইজের কাছাকাছি। এদিকে চুপসে যেতে যেতে একটা নিউট্রন স্টারের ঘনত্ব এত বেশি যে ওটা এখন দশ হাজার থেকে দশ কিলোমিটারে নেমে এসেছে। পৃথিবীর সাইজের একটা বল হঠাৎ কলকাতার সাইজে এসে গেল। যেহেতু আরো আটোসাঁটোভাবে বাঁধা, তাই হঠাৎ করে প্রচুর মাধ্যাকর্ষণজাত বন্ধনশক্তি বা gravitational binding energy ছাড়া পেয়ে গেল। আর সেই শক্তি যাবে কোথায়? জিনিসপত্র গরম করতে যেতে পারে। তো, এই নিউট্রন স্টারটা খুব গরম হয়ে যায়।

আলো হিসেবে শক্তিটা বেরোতে পারবে না। কারণ সেই কম্পটন বিক্ষেপণ। নিউট্রন স্টারের চারিদিকে ইলেক্ট্রনের চাদর, আটকে দেয় আলোককণাকে।

এই মাধ্যাকর্ষণজাত বন্ধনশক্তি, এটা বেরোচ্ছে কিভাবে নিউট্রন স্টার থেকে?

ওই যে বললাম নিউট্রিনো বেরোয়। তারই গতিশক্তির মধ্যে দিয়ে। ওই নিউট্রন স্টার থেকে খালি নিউট্রিনোরাই বেরিয়ে আসতে পারে। নিউট্রিনোরা সচরাচর কারোর সাথে ধাক্কাধাক্কি করে না, সবকিছু ভেদ করে চুপিসারে চলে যায়। কিন্তু এই নিউট্রন স্টারের ঘনত্ব এত বেশি যে নিউট্রিনোগুলোরও ওই দশ কিলোমিটার পেরোতে এক থেকে দশ সেকেন্ড সময় লেগে যায়। ধাক্কা খেতে খেতে বেরোয়। ঘনত্ব কত বেশি সেটা যদি বোঝাতে হয়, ভাবো সেটা একটা নিউক্লিয়াসের সমান। নিউট্রন স্টারটা একটা প্রকান্ড সাইজের নিউক্লিয়াস।

একদিকে নিউট্রিনোরা বেরিয়ে আসছে। আর অন্যদিকে তাঁরার বাইরের স্তরগুলো যখন দেখে তাঁরার কেন্দ্রস্থলটা চুপসে গেছে, তখন তাঁরাও সেই ফাঁকা জায়গার দিকে ধেয়ে আসে। নিউট্রন স্টার তাতে ধাক্কা খায়। বাউন্স করে ছিটকে যায়। এই বাউন্স করার ফলে একটা শক বা অভিঘাত সৃষ্টি হয়। আর নিউট্রিনোদের সাহায্যে সেই শক পুরো তারা জুড়ে ছড়িয়ে পরে। তার ফলে কেন্দ্রস্থলের বাইরে যে স্তরগুলো ছিল, সেগুলো ছিটকে যায় একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মধ্যে দিয়ে। এটাই সুপারনোভা।

নিউট্রিনো শকটাকে ছড়াচ্ছে কিভাবে? তার মানে, ওই এক থেকে দশ সেকেন্ডের ধাক্কাধাক্কির মধ্যেই যেটুকু শক্তি হাতবদল করতে পারছে ?

হ্যাঁ, নিজেদের শক্তির ১% মত দেয় কেন্দ্রস্থলের বাইরের স্তরগুলোকে। তবে নিউট্রন স্টার থেকে বেরোনোর সময় নিউট্রিনোর শক্তি ছিল $১০^{৫৩}$ আর্গ, অতএব তার ১%-ও কম নয়। $১০^{৫১}$ আর্গ মত।

আবার বলছি, যেহেতু তাঁরাটা এত ঘন, তাই এই ১% মত নিউট্রিনো আটকায়। একগুচ্ছ নিউট্রিনো আমাদের মধ্যে দিয়ে গেলে তার প্রায় কিছুই আটকায় না। নিউট্রিনোরা যাচ্ছেই আমাদের মধ্যে দিয়ে সারাক্ষণ। কেউই বিব্রত হয় না।

তো, সুপারনোভা বিস্ফোরণ বলতে এই ১%-কেই দেখতে পাচ্ছি?

হ্যাঁ। শুধু একটা কথা, এটা খালি গতিশক্তির কথা বলছি। তাঁরার মালপত্র বিশাল গতিতে এদিক ওদিক ধেয়ে চলেছে। তা চলুক না, কিন্তু দূর থেকে তাঁদের দেখতে পাওয়া যাবে কেন? দেখতে পাওয়া যাবে, কারণ গরম হওয়ার ফলে এর থেকে আলো বেরোবে। তো, আলো বেরোলে তবেই সুপারনোভাদের দেখা যায়।

এবার মনে রাখতে হবে, এই বিস্ফোরণটা হয় মহাশূন্যে। তাই খুব তাড়াতাড়ি সবকিছু ছড়িয়ে পড়ে। ধরো, প্রথম দিন একটা সুপারনোভাকে অপটিক্যাল (দৃশ্যমান) আলোয় দেখতে পেলাম, অর্থাৎ যে আলোটা চোখে দেখা যায়। দশ দিনের মধ্যেই এই সুপারনোভা দশগুন সাইজে পৌঁছে গেল। এর ফলে, বহুগুণ ঠাণ্ডাও হয়ে যায়। তখন আর অপটিক্যাল আলো দেয় না। তখন ইনফ্রারেড আলো দেয়।

তাহলে, একটা সুপারনোভাকে আমাদের বেশিক্ষণ দেখতে পাওয়া উচিত নয়। কিন্তু আমরা মাসের পর মাস একটা সুপারনোভাকে আকাশে উজ্জ্বল অবস্থায় দেখতে পাই।

মাসের পর মাস সুপারনোভা দেখা যায় কেন ?

এই যে প্রকাণ্ড বিস্ফোরণটা ঘটলো, এর মধ্যে আরো কিছু নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি হয়। আমরা আগে বলেছিলাম নিউক্লিয়ার ফিউসনের কথা। বলেছিলাম, ফিউসনের দ্বারা আয়রন অব্দি পৌঁছনো যায়, কারণ আয়রন নিউক্লিয়াস সবচেয়ে স্থায়ী। সেইসব ফিউসনে খালি শক্তি পাওয়া যায়, দিতে হয় না। কিন্তু সেটা সুস্থিত অবস্থার কথা। বিস্ফোরণের সময় এমন বিক্রিয়াও হয় যারা শক্তি নিয়ে নেয়। তাই সুপারনোভা বিস্ফোরণের সময় আয়রনোত্তর মৌলগুলোও তৈরী হয়।

আয়রনের পরে, বিশেষ করে লেডেরও পরে যে মৌলগুলো আছে, তাঁরা বেশিরভাগ-ই স্থায়ী নয়।

তেজস্ক্রিয়?

হ্যাঁ, তেজস্ক্রিয়। এবং সুপারনোভা ফাটার পর কয়েক মাস ধরে এই তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ফলে যে গামা রশ্মি বেরোয়, সেই গামা রশ্মিগুলো সুপারনোভার উপাদানগুলোকে গরম করতে থাকে। আর গরম হয়ে যাওয়ার ফলে এরা এমন একটা তাপমাত্রায় থাকে, যাতে অপটিক্যাল রেঞ্জের মধ্যে আলো দিতে পারে।

সাথে সাথে কিন্তু ঠাণ্ডা হওয়ার প্রক্রিয়াগুলোও চলছে। ফাঁকা মহাশূন্যে সমতাপী বা অ্যাডায়াবেটিক ভাবে সুপারনোভার প্রসার হয়, তার ফলে ঠাণ্ডাও হয়। অনেক কম দ্রুতভাবে, কিন্তু আলো বেরোনোর ফলেও ঠাণ্ডা হতে থাকে।

এইসব গরম আর ঠান্ডা হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা চলে। সেই প্রতিযোগিতার ফলে যে তাপমাত্রা বজায় থাকে, তাতে অপটিক্যাল আলো বের হয় সুপারনোভা থেকে।

সুপারনোভা থেকে বেরোয় এবং চোখে দেখা যায়, এরকম আলোর শক্তি $১০^{৪৯}$ আর্গ মত। সেটা তার মানে সুপারনোভার গতিশক্তির ১%। তার মানে নিউট্রিনোর শক্তির ১%-এর ১% আলোর রূপে বের হয়। তবে সেটাও এত আলো যে এই সময়টায় একটা গোটা ছায়াপথের আলোকে ছাপিয়ে যেতে পারে একটা সুপারনোভা। একটা ছায়াপথে লক্ষ কোটি তারা থাকে, তাঁদের সম্মিলিত আলোকে ছাপিয়ে যেতে পারে একটা সুপারনোভা।

সেই আলোটা নিয়েই তোমাদের কারবার ?

সেই আলোটাকেই সনাক্ত করে অপটিক্যাল জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা।

এই আলোটা কতটা উজ্জ্বল?

কতটা আলো সেটা নির্ভর করে কতটা দূরত্ব, তার উপর। বেশিরভাগ যে সুপারনোভা আমরা দেখি, সেগুলো বেশ দূরে—

মোটামুটি কত দূর হবে?

আমি যেসব সুপারনোভাদের নিয়ে গবেষণা করি, সেগুলো কয়েক মেগাপারসেক দূরে। এক পারসেক হচ্ছে তিন আলোকবর্ষের থেকে একটু বেশি। তাহলে মেগাপারসেক মানে ৩০ লক্ষ আলোকবর্ষ মত। তার মানে বহু লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে আছে সুপারনোভারা।

আর তার আলো আমরা দেখছি দূরবীন দিয়ে। শেষ চোখে দেখা সুপারনোভা ঘটেছিল কেপলারের সময়। ১৬০৪ সালে কেপলার আমাদেরই ছায়াপথে হওয়া একটি সুপারনোভা নিজের চোখে দেখেন এবং লিখে যান।

|| সুপারনোভা দেখতে হলে ||

তিনি কি এটাকে সুপারনোভা হিসেবে লিখে যান?

তিনি ওটাকে একটা উজ্জ্বল তারা হিসেবে সনাক্ত করেন। তিনি লক্ষ্য করেন সেটা সারপেন্স বলে একটা নক্ষত্রমন্ডলের পায়ের কাছে। তিনি ল্যাটিনে তার খাতায় লেখেন *স্টেলা নোভা* , অর্থাৎ নতুন তারা। *এন পেদে সারপেন্তারি* অর্থাৎ সারপেন্সের পায়ের কাছে।

ছবিটবি এঁকে কোন নক্ষত্রমন্ডলের কোথায় আছে সেটা দেখিয়ে যান। এখন আমরা সেটাকে কেপলার সুপারনোভার ভগ্নাবশিষ্ঠ বলে জানি। সুপারনোভা বিস্ফোরণের ফলে যেসব জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে, সেগুলো তার আশেপাশের জিনিসকে শক ওয়েভ বা অভিঘাতের তরঙ্গের মাধ্যমে এত গরম করে তোলে যে সেই জায়গা এখনো গরম হয়ে আছে। সেই জায়গা থেকে এখনো এক্স-রে আলো বেরিয়ে চলেছে। এক্স-রে দূরবীনের সাহায্যে কেপলারের সুপারনোভার সেই গরম জায়গাগুলোকে এখনো আমরা দেখতে পাই।

কেপলারের নোভা শব্দটা আমরা এখনো ব্যবহার করি।

হ্যাঁ, যদিও নোভা মানে নতুন। বৈজ্ঞানিক মহলে এক ধরণের বিস্ফোরণের শ্রেণীকে নোভা নাম দেওয়া হয়। আর যেগুলো খুব বেশি আলো দেয়, তাঁদের সুপারনোভা বলা হয়।

আচ্ছা, এই সুপারনোভার আলো যখন সনাক্ত করো তোমরা, মহাকাশে অন্য কোনো ঘটনার সাথে একে আলাদা করো কি করে? সুপারনোভার আলো সেটা নিশ্চিত হও কি করে?

যারা আলো দেখে সুপারনোভা সনাক্ত করে, তাঁরা প্রত্যেক রাতে একটা নক্ষত্রমণ্ডলের ছবি তোলে। আগের রাতের ছবির সাথে মিলিয়ে দেখে কিছু তফাৎ আছে কিনা। সাধারণত যে তফাৎটা দেখা যায়, সেটা হলো এইরকম: একটা ফুটকি থেকে এত আলো বেরোচ্ছে যে গোটা নক্ষত্রমণ্ডলের আলোকে ছাপিয়ে যাচ্ছে। একটা দূরের নক্ষত্রমণ্ডলে এমন একটা ঘটনা, যেখানে একটা ছোট্ট জায়গা থেকে এত আলো বেরোচ্ছে যে নক্ষত্রমণ্ডলের আলো ছাপিয়ে যাচ্ছে, এরকম একমাত্র সুপারনোভারাই করতে পারে বলে আমাদের ধারণা।

সেইভাবে সুপারনোভাদের সহজেই সনাক্ত করা যায়। আমি নিজের গবেষণার কাজে অপটিক্যাল আলোর সুপারনোভা সনাক্ত করি না যদিও। অন্য লোকে সনাক্ত করলে সেই সুপারনোভাকে নিয়ে আরো গভীরে গবেষণা করি।

কি ধরণের গবেষণা করো তুমি?

আমার গবেষণার বিষয়, সুপারনোভার ফলে আশেপাশের জিনিসের কি হয়। তার জন্য আগে জানা জরুরি, আশেপাশে আছে কি। আমি যখন ছোট ছিলাম, আমাকে লোকজন বলেছিল যে মহাশূন্য হচ্ছে হচ্ছে একটা ভ্যাকুয়াম বা শুন্যস্থান। একদম ঠিক নয় সেটা।

কেন, মহাশূন্য শূন্যস্থান নয় কেন?

গ্যাস আছে, ধূলিকণা আছে। এই গ্যাসই একসময় মাধ্যাকর্ষণের ফলে দানা বেঁধে তারা তৈরী হয়, গ্রহ তৈরী হয়। মহাশূন্যে কিছু না থাকলে আজ আমরাও থাকতাম না।

সুপারনোভার ফলে যে জিনিসপত্র ছিটকে যায়, এদের সাথে এই গ্যাস, ধূলো, বা যাকে বলা হয় ইন্টারস্টেলার পদার্থ, তাদের ঠোকাঠুকি হয়। সেই ঠোকাঠুকি মোটেও শান্তিপূর্ণ নয়। একটা শক ওয়েভের মাধ্যমে হয় এটা। সেই শক ওয়েভের ফলে আশেপাশের জিনিস এত গরম হয়ে ওঠে যে তার থেকে এক্স-রে রশ্মি বের হয়।

আমি সেই এক্স-রে আলো দূরবীন দিয়ে পাকড়াও করি। এটা করার জন্য সবথেকে ভালো দূরবীন কিন্তু পৃথিবীর উপর নেই। কারণ পৃথিবীতে এক্স-রে আলো এসে পৌঁছয় না। বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তর আমাদের বাঁচিয়ে দেয় এই এক্স-রে থেকে। এই দূরবীন সেইজন্য থাকে কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যে। বর্তমানে যে এক্স-রে দূরবীনটা সুপারনোভা সনাক্তকরণের কাজে আমি ব্যবহার করি, সেটা NASA চালায়। সুব্রহ্মণীয়ম চন্দ্রশেখরের স্মৃতিতে সেই দূরবীনের নাম দিয়েছে চন্দ্র। চন্দ্র এক্স-রে অবসারভেটরি নামে এই টেলিস্কোপের সাহায্যে আমি সুপারনোভা থেকে বেরোনো এক্স-রে আলো দেখি, আর বোঝার চেষ্টা করি সুপারনোভার ধাক্কায় আশেপাশের কি অবস্থা হয়েছে।

এই গবেষণা থেকে আমরা কি বুঝবো আশা করি?

সুপারনোভারা কিভাবে ফাটে, তার নানারকম মডেল আছে। এই যে এতক্ষণ যা বললাম সুপারনোভাদের ফাটার গল্প, সেটা বেশ মোটা দাগে আঁকা। এর সূক্ষ্ম ছবি আমাদের কাছে এখনো স্পষ্ট নয়। নানা ডিটেল এখনো জানি না আমরা। যার ফলে একটা মডেল থেকে আরেকটার তফাৎ করার রসদ নেই। অনেক মডেলই টিকে আছে। কোনটা যে ঠিক, কোনটা ভুল, আমরা স্পষ্ট জানি না। শুধু তাই নয়, কোন রকমের তারা ফেটে সুপারনোভা হয়, সেই নিয়েও আমাদের কিছু প্রশ্ন এখনো আছে।

আমার কাজে আমি যেটা করি, পর্যবেক্ষণের সাহায্যে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করি। তারারা তাদের জীবৎকালে তাঁদের আশেপাশের পরিবেশকে, যাকে বলে স্টেলার উইন্ড বা নাক্ষত্রিক ঝড়ের মাধ্যমে প্রভাবিত করে। এক একটা তারার প্রভাব আলাদা। তারার আশেপাশের ইন্টারস্টেলার পদার্থের ঘনত্ব বা বিন্যাস সেই ঝড়ের মাধ্যমেই সেট হয়েছে। তাই সেইসব ইন্টারস্টেলার পদার্থ এক অর্থে তারার পরিচয় বহন করে।

এদিকে, সুপারনোভা বিস্ফোরণও হয় নানা ধরণের।

কোন তারা কিভাবে ফাটছে, তার উপর নির্ভর করে ইন্টারস্টেলার পদার্থের মধ্যে কিভাবে তার প্রকাশ ঘটবে। এক্স-রে নির্গমন কতটা হবে, কতক্ষণ ধরে হবে, গ্যাসের তাপমাত্রার বিন্যাস কিরকম হবে, এইসব খুঁটিনাটি আলাদা হয়। আমি এইসব খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ করে জীবৎকালে তাঁরাদের আর সুপারনোভাদের মধ্যে যোগসাজশটা বোঝার চেষ্টা করি। এর থেকে বোঝা যাবে কোন মডেলগুলো সত্যি।

আচ্ছা, এই যে তারার জন্ম থেকে আয়রন কেন্দ্রস্থল তৈরী হওয়া, দিয়ে সেটা সুপারনোভাতে গিয়ে শেষ হওয়া। কতটা সময়ের ব্যবধানের কথা বলছি আমরা?

একটা চালু কথা আছে, যত ভারী তারা, তত কম বাঁচে। যে তারারা সুপারনোভাতে গিয়ে শেষ হয়, তারা সবচেয়ে কম দিন বাঁচে। কিন্তু সেই কম দিন মানে লক্ষ লক্ষ বছর। ১০ লক্ষের ঘর থেকে ৫০০-১০০০ লক্ষ অব্দি বাঁচতে পারে।

কিন্তু এটা খুবই কম, এই ধরো সূর্যের তুলনায়। সূর্য কয়েকশো কোটি বছর ধরে বেঁচে আছে। আরো কয়েকশো কোটি বছর বেঁচে থাকবে আশা করা যায়।

তারা যত বড়, তার ভিতর নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার হার অনেক বেশি। তাদের কাছে মজুত জ্বালানিও বেশি কিন্তু তাকে ছাপিয়ে যায় এই বিক্রিয়ার হার। কয়েকশো লক্ষ বছর পর এরাই ফেটে সুপারনোভা হয়। একবার সুপারনোভা হলে ভিতরের আয়রন কেন্দ্রস্থলটা চুপসে যেতে সেকেন্ডেরও কম সময় লাগে।

তার মানে আয়রন কেন্দ্রস্থলটা তৈরী হতে লক্ষ বছর লাগে?

তাও না। মালমশলা যত ভারী হয়, নিউক্লিয়ার ফিউসনগুলো তত কম সময় নেয়। হাইড্রোজেন পোড়াতে সবথেকে বেশি সময় লাগে, হিলিয়াম তার থেকে কম। একবার একটা সিলিকনের বল বানিয়ে ফেললে সেখান

থেকে আয়রন অব্দি পৌঁছতে গোটা ব্যাপারটাই হপ্তাখানেক মত লাগে। শেষের স্টেজ গুলো কয়েকদিনের ব্যাপারে গিয়ে দাঁড়ায়।

শেষে কোলাপ্সটা কয়েক সেকেন্ডের ব্যপার। নিউট্রিনোও বেরোয় সঙ্গে সঙ্গেই, কিন্তু গোটা জিনিসটা থেকে অপটিক্যাল রেঞ্জে আলো বেরোতে আরো কিছুদিন লাগে। সেই আলো সপ্তাহখানেক ধরে বেরোতে থাকে, তারপর সেটা ঝিমিয়ে পড়ে। বিস্ফোরণ কিন্তু তখনও হয়ে চলেছে। অর্থাৎ আশেপাশের পরিবেশের সাথে ক্রিয়াবিক্রিয়াও হয়ে চলেছে। বছরখানেক ধরে তার থেকে এক্স-রে বা রেডিও তরঙ্গ বেরোয়। সেগুলোকে আমি পর্যবেক্ষণ করি।

এই বিস্ফোরণ শান্ত কখন হবে? যত জিনিস বেরিয়েছে, সবাই কিছু না কিছুর সাথে ধাক্কা খাবে, তবে শান্ত হবে। এই সময়টা কত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সেদভ, ভন নয়মান আর টেলর নামে তিন বিজ্ঞানী আলাদা আলাদা ভাবে হিসেবটা কষেছিলেন। পৃথিবী যদি আজ ফেটে পড়ে, সেই সময়টার মান কয়েক সেকেন্ড হবে। কিন্তু সুপারনোভার ক্ষেত্রে সেটা শয়ে শয়ে বছর থেকে হাজার বছর অব্দি হতে পারে। সেজন্য আমরা কেপলারের সুপারনোভার চিহ্ন এখনো অব্দি দেখতে পাই।

কেপলারের সুপারনোভাই কি শেষ? তারপর আর দেখা যায়নি? এত তো তারা!

খুব কম তারারাই তত ভারী। আর একদম দেখা যায়নি, তা নয়। তবে এটা ঠিক যে *আমাদের ছায়াপথে* খুব বেশি ফাটেনি বা ফেটে থাকলেও আমরা তাদের দেখিনি। দু'একটা আছে, যার ভগ্নাবশেষ সাইজে কেপলারের সুপারনোভার থেকে ছোট, তাই আমাদের আন্দাজ সেগুলো পরে ফেটেছে। কিন্তু ফাটাটা কারো চোখে পড়েনি। এক হতে পারে কেউ দেখছিল না। অথবা হতে পারে গ্যাস আর ধূলিকণার আড়ালে এই সুপারনোভা ঘটেছে। তার ফলে দেখা যায়নি।

সেই কেপলারের সময়কার সুপারনোভা নিয়েই এখনো গবেষণা চলছে? দূরের ছায়াপথগুলো নিয়ে আমরা গবেষণা করি না?

না, সেরকম নয়। আমি দূরের সুপারনোভার চিহ্নগুলো নিয়েই ঘাঁটাঘাঁটি করি।

তবে, এটা ইন্টারেষ্টিং ব্যাপার যে খুব কম তারা, ১% মত, যথেষ্ট ভারী এবং সুপারনোভায় গিয়ে শেষ হয়। আমাদের এই ছায়াপথে কতগুলো তারা, কারা সুপারনোভা হয়ে ফাটতে পারে, তাদের বয়েস কত, এইসব হিসেব কষে দেখা গেছে যে প্রত্যেক শতাব্দীতে একটা করে সুপারনোভা ফাটা উচিত। শেষ একশো বছরে একটাও ফাটেনি, সেটা একটু বেমানান বটে। হতেই পারে ফাটেনি, কারণ এইসব হিসেব তো প্রবাবিলিটির অঙ্ক। একটা পয়সার হেড পড়ার সম্ভাবনা অর্ধেক মানেই যে চার বারে দুবার হেড পড়বে তার মানে নেই।

কিন্তু আমার ধারণা, আরো কিছু সুপারনোভা ফেটেছে – লোকে দেখেনি বা গ্যাস কি ধূলিকণার আড়ালে ফেটেছে।

সব ছায়াপথ ধরলে কত সুপারনোভা দেখা গেছে?

ওহ তাহলে তো রোজ একাধিক সুপারনোভা দেখা যায়। এতো এতো ছায়াপথ!

এদের নামকরণ কিভাবে হয়, একটার থেকে আরেকটাকে আলাদা করতে?

প্রথমে সাল, তারপর A,B,C,D জুড়ে। ১৯৮৭-এ প্রথম যে সুপারনোভাটা দেখা গেল সেটা ১৯৮৭A। পরেরটা ১৯৮৭B, এইরকম। আগে ভাবা হয়েছিলো বছরে দু তিনটেই বেরোবে, তাই এই নামকরণের পদ্ধতি ছিল। তারপর একসময় দেখা গেল বছরে ছাব্বিশটার থেকে বেশি সুপারনোভা দেখা যাচ্ছে। তখন Z-এর পর AA এইরম নাম দেওয়া শুরু হলো। করতে করতে এখন তিনটে অক্ষর লাগবে কিনা লোকে চিন্তা করছে!

আমাদের টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চের ছাদে একটা দূরবীন ছিল। ১৪ ইঞ্চি ব্যাস, ছোট দূরবীন। সেই দূরবীন দিয়ে কাছের একটা ছায়াপথের সুপারনোভা আমি একবার দেখেছিলাম। অবশ্য, সেটা ঠিক আবিষ্কার করিনি। দেখা গেছিল আগেই, আমি যাচাই করে দেখলাম ঠিক কিনা।

কিন্তু তার মানে ওই টেলিস্কোপটা দিয়েও সুপারনোভা আবিষ্কার করা যেত। ছায়াপথের ছবি ফাটার আগে আর পরে তুলে দুটোকে তুলনা করলে ধরা পড়তো। ওইরকম সাইজের দূরবীন দিয়ে প্রচুর অপেশাদাররাও প্রচুর সুপারনোভা খুঁজে পায়।

অপেশাদাররা আবিষ্কার করলে সেটা কিভাবে জানা যায়?

সেন্ট্রাল বুরো ফর অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল টেলিগ্রাম্স বলে একটা সংস্থা আছে। টেলিগ্রামের যুগে সেটা তৈরী হয়েছিল। সংস্থাটির সদর দপ্তর এই পাড়াতেই (হার্ভার্ডে)। আগেকারদিনে কেউ যদি মনে করতো সুপারনোভা দেখেছে, তাহলে তাঁদের তার মারফৎ জানাতো। তাঁরা তখন বাকি সব জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের তার পাঠাতো, যাতে কেউ সেটা যাচাই করতে পারে।

এখন তো তার উঠে গেছে। এখন ই-মেল মারফৎ সেই যোগাযোগটা হয়।

ধরো আজকে কেউ একটা সুপারনোভা দেখলো, তাকে কি করতে হবে সেটা ক্যাটালগ করাতে?

সে এইরম একটা ই-মেল করবে এদের: এই দেখো, এত তারিখে আমি ছায়াপথের এই ছবিটা দেখেছিলাম। তখন এইখানে কোনো ফুটকি ছিল না। এখন আবার ছবি তুলেছি, তাতে একটা ফুটকি রয়েছে। নিশ্চয়ই সুপারনোভা।

তাঁরা তখন দেখবে, এটা যে অন্য হাজারটা জিনিস নয়, সেটা কি করে জানা গেল? নানান জিনিস দেখা হবে। যেমন, ওই সময়ে আকাশে কোনো উপগ্রহ যাচ্ছিল কিনা, প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম। কৃত্রিম উপগ্রহগুলো অনেক সময় আবার চকচকে হয়।

তারপরেও, সাধারণত একটা ছবিতে হয় না। কাউকে একটা সুনিশ্চিত করতে হয় আরো ছবি তুলে। আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিলো সেটা বলি। আমি একটা ই-মেল অ্যাড্রেসে সাবস্ক্রাইব করে বসে থাকতাম, যেখানে পরপর প্রচুর ছবি আসতো, বেশিরভাগই লো কোয়ালিটির। যা ই-মেল আসতো সেখানে, সব আমার কাছেও আসতো।

একবার টেলিস্কোপ সাইটে বসে আছি, হঠাৎ ওরম মেল এলো। আমার কাছে তখন একটা বিশাল টেলিস্কোপ।

কোথায় ছিল টেলিস্কোপটা?

লাদাখে। আমি নিজে লাদাখে নেই, তখন লাদাখে -৫০ ডিগ্রী সেলসিয়াস। আমি আছি বেঙ্গালুরুর কাছে একটা গ্রামে, কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে টেলিস্কোপটাকে পরিচালনা করছি। ই-মেলটা পেয়ে আমি টেলিস্কোপটাকে নির্দিষ্ট ছায়াপথের দিকে তাক করে সুপারনোভাটার একটা স্পেকট্রাম নিয়ে ফেললাম। অর্থাৎ, আলোটাকে তার বিভিন্ন বর্ণে ভেঙ্গে ফেললাম, দিয়ে দেখলাম কোন বর্ণের কতটা যোগদান। একবার স্পেকট্রাম দেখতে পেলে সুপারনোভার টাইপটাও বোঝা যায় সহজেই।

তখন, টেলিগ্রামওয়ালাদের বললাম যে ঠিকই খবর এসেছে, এটা একটা সুপারনোভাই বটে। তখন ওটা অফিসিয়ালি একটা সুপারনোভা হিসেবে চিহ্নিত হলো।

এইরকমভাবে অনেকসময় পেশাদাররা টেলিস্কোপের সামনে থাকলে চটপট স্পেকট্রাম নিয়ে নিতে পারে। সেক্ষেত্রে আর সন্দেহ থাকে না সুপারনোভা কিনা আর সুপারনোভা হলেও তার কি টাইপ। কারণ একটা সুপারনোভার স্পেকট্রাম খুব বিচিত্র হয়, অন্য সবকিছুর স্পেকট্রামের থেকে বেশ আলাদা।

সুপারনোভার স্পেকট্রাম কিভাবে আলাদা বাকিদের থেকে?

সূর্যের স্পেকট্রামে যেমন ফ্রনহফার লাইন দেখা যায় নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যে। ওই তরঙ্গদৈর্ঘ্যতে ঝপ করে আলোর তেজ কমে গেছে। সেরমই, সুপারনোভার স্পেকট্রামেও ওরম লাইন দেখা যায়। লাইনগুলোর কারণ হলো, ওই তরঙ্গদৈর্ঘের আলো খেয়ে নিতে পারে সুপারনোভার মধ্যে থাকা মৌলগুলো।

কিন্তু, সুপারনোভার পরিচয় পাওয়া যায় এর থেকে যে লাইনগুলো ভীষণ মোটা। মোটা মানে লাইনটা অনেকগুলো তরঙ্গদৈর্ঘ্যেরর উপর ছড়িয়ে আছে। তার কারণ আলোর উৎসের গতির ফলে ডপলার এফেক্ট। মহাকাশে অন্য কোনো কিছুই যেহেতু ১০ হাজার কিলোমিটার পার সেকেন্ডের গতিতে ছুটছে না, তাই এতো মোটা স্পেক্ট্রাল লাইন আর কারো নেই।

ডপলার এফেক্টের জন্য লাইনের আপাত তরঙ্গদৈর্ঘ্য পাল্টানোর কথা। অনেকগুলো তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উপর ছড়িয়ে যাওয়ার কারণ কি?

কারণ আলোর উৎস সব তো তোমার দিকে আসছে না। কিছু তোমার দিকে, কিছু অন্য দিকে। শুধু তোমার দিকে গতিটুকু দেখলে সেই গতির মান অনেক কিছু হতে পারে। তাই স্পেক্ট্রাল লাইনগুলোও মোটা।

কতটা মোটা সুপারনোভার লাইনগুলো?

৬০০০ অ্যাঙ্গস্ট্রমের কাছাকাছি একটা লাইন আছে, হাইড্রোজেন খেয়ে নেয় সেই আলোটাকে, তার নাম H-আলফা। সেই লাইনটা খুব সহজেই দেখা যায়। এই লাইনটার তরঙ্গদৈর্ঘ্য যতটা ছড়িয়ে পড়ে, সেটা ওই মূল তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কয়েক পার্সেন্টের কাছাকাছি।

মানে, ৬০০০ অ্যাঙ্গস্ট্রম লাইন ৬০০ অ্যাঙ্গস্ট্রম জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে?

হ্যাঁ, তার থেকে ডপলার এফেক্টের অঙ্কটা কষলে আলোর উৎসের গতি দাঁড়ায় আলোর গতির প্রায় ১/৩০ ভগ্নাংশ মত। অত গতি একমাত্র সুপারনোভার থেকে ছিটকে যাওয়া বস্তুরই হতে পারে। তাই, স্পেকট্রাম নিলে সুপারনোভাদের খুব সহজেই চেনা যায়।

এদ্দূর যখন বললাম, আমার একটা গবেষণার বিষয় নিয়ে সংক্ষেপে একটু বলি। যেরম বললাম, আমি সুপারনোভা থেকে বেরোনো এক্স-রে আর রেডিও তরঙ্গ দেখি। এরা কিন্তু নানারকম প্রক্রিয়া থেকে বের হয়। কিছু এক্স-রে বের হয়, স্রেফ গ্যাসটা গরম বলে। যাকে বলে ব্রেমস্ট্রাহলুং।

রেডিও তরঙ্গ সাধারণত যাকে বলে সিনক্রোটন বিকিরণের মাধ্যমে বের হয়। সেটা কি? সুপারনোভার শক ওয়েভস বা অভিঘাত তরঙ্গ এক অর্থে পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেটরের কাজ করে। এই তরঙ্গগুলি এত বেশি শক্তি অব্দি তারার ইলেক্ট্রনগুলোকে পৌঁছে দেয়, যে তারা রিলেটিভিস্টিক হয়ে যায়। অর্থাৎ, আলোর কাছাকাছি তাদের গতি। এই অবস্থায় তাদের যদি একটা চৌম্বকক্ষেত্রে ফেলা হয়, তাদের থেকে সিনক্রোটন বিকিরণ বের হয়। যা আমরা রেডিও তরঙ্গ হিসেবে দেখি।

আমার একটা কাজ হলো বোঝার চেষ্টা করা, এই সুপারনোভা কত এফিসিয়েন্ট ভাবে ইলেক্ট্রনের গতিবৃদ্ধি করে। এটা শুধু কতটা রেডিও তরঙ্গ আসছে তার থেকে বোঝা মুশকিল। অল্প শক্তির চৌম্বকক্ষেত্রে অনেক ইলেক্ট্রন ফেললেও যতটা বিকিরণ হয়, অনেক বেশি শক্তির চৌম্বকক্ষেত্রে কয়েকটা ইলেক্ট্রন ফেললেও ততটাই হয়।

আমরা তফাৎটা করার একটা উপায় বার করেছি। এই যে প্রচণ্ড গতির ইলেক্ট্রন, এদের সাথে সুপারনোভা থেকে বেরোনো অপটিক্যাল আলোর ইনভার্স কম্পটন বিক্ষেপণ হয়। কম্পটন বিক্ষেপণ আগেই বললাম, এটা তার উল্টো। খুব কম শক্তির আলোককণার সাথে বেশি শক্তির ইলেক্ট্রন ধাক্কা খেলে, এখানে ইলেক্ট্রনটা শান্ত হয়ে যায়, আলোককণার শক্তি বেড়ে যায়। শক্তি বেড়ে যাওয়ার ফলে অপটিক্যাল আলোর কম্পাঙ্ক বেড়ে এক্স-রের ঘরে চলে যেতে পারে। আর তার ফলে আমি যে এক্স-রে দেখছি, তাতে ওই ইনভার্স কম্পটন বিক্ষিপ্ত আলোককণা মিশে থাকতে পারে। সেই মিশে থাকা আলোককণাগুলোকে ধরতে পারলে, কত ইলেক্ট্রন ছিল সেটা বার করে ফেলা যায়। সেটা বার করে ফেললে রেডিও তরঙ্গের সাহায্যে কতটা চৌম্বকশক্তি ছিল, সেটাও বার করে ফেলা যায়।

এইভাবে বোঝা যায়, সুপারনোভা কত এফিসিয়েন্ট ভাবে একটা পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেটরের কাজ করে। তিনটে তরঙ্গের আলো, অপটিক্যাল, এক্স-রে আর রেডিও, এদের মিলিয়ে আমি এইটা বোঝার চেষ্টা করছি।

আচ্ছা, এবার তোমার বিশেষ কাজ থেকে একটু বেরিয়ে দেখলে, এই যে সুপারনোভা নিয়ে গবেষণা, এর দ্বারা আমরা ঠিক কি বোঝার চেষ্টা করছি?

আমাদের এই মহাবিশ্ব বেশিরভাগটাই হাইড্রোজেন থেকে শুরু। কিন্তু, আশেপাশে হাইড্রোজেন ছাড়াও তো কত মৌল দেখি। কার্বন, অক্সিজেন, হ্যান ত্যান। মহাবিশ্বের আদিতে এরা তো ছিল না। হাইড্রোজেন ছিল, হিলিয়াম ছিল, একটুখানি লিথিয়াম ছিল, বাকি প্রায় কিছুই ছিল না। হাইড্রোজেন ছাড়া এই যে মৌলগুলো, এরা সব নিউক্লিয়ার ফিউসনের ফলে তৈরী হয়। আর নিউক্লিয়ার ফিউসন কেবলমাত্র তারার মধ্যে হয়।

তারারা নিউক্লিয়ার ফিউসন করতে পারে কারণ তাদের প্রবল মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে। কিন্তু একই সাথে এই মাধ্যাকর্ষণ নিউক্লিয়ার ফিউসনের দ্বারা তৈরী মৌলগুলোকে ধরেও বসে থাকে। তারা থেকে বেরোয় না এরা। তারা থেকে বেরোতে গেলে তারাটাকে ফাটতে হয়। সুপারনোভার দ্বারাই সেটা ফাটে।

আর তখনি আশেপাশে ছড়িয়ে পরে এই ভারী মৌলগুলো। ফলে আশেপাশের পরিবেশে মৌলের বৈচিত্র্য আরো বাড়ে। একসময় এর থেকেই গ্রহ, ইত্যাদি তৈরী হয়। একসময় মানুষ আসে। ভেবে দেখো, আমাদের রক্তে হিমোগ্লোবিন, তার মধ্যে যে আয়রন, সেই আয়রন কিন্তু একটা সুপারনোভা থেকে এসেছে।

তাহলে বলছো, এই সুপারনোভা গবেষণার মাধ্যমে তোমরা এই মহাবিশ্বের বিবর্তনের ইতিহাস বোঝার চেষ্টা করছো?

হ্যাঁ, আদতে সবকিছুই তারার ভিতরের মালমশলা থেকে আসছে। আমাদের আশেপাশের মহাবিশ্ব যে এতটা বিচিত্র, হাইড্রোজেন ছাড়াও যে এত কিছু আছে, সেইটাতে সুপারনোভার অবদান প্রচুর।

এই গবেষণায় আমরা দেখি, সুপারনোভা বিস্ফোরণ থেকে কি বেরিয়ে আসছে। সুপারনোভার এক্স-রে স্পেকট্রামের মধ্যেই নানা মৌলের চিহ্ন পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, কোন মৌল কতটা করে আছে, কি অবস্থায় আছে, সেটা কিভাবে আশেপাশের পরিবেশকে প্রভাবিত করছে, সেসবও বোঝা যায়।

আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করবে, আমরা আশেপাশের যেসব জিনিস দেখি, সব মৌল কিন্তু তাতে একই পরিমাণে নেই। এই যে, কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, এরা এত বেশি, তার কারণ হচ্ছে তারাদের মধ্যে যে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া হয়, তাতে এরা অনেক বেশি সুবিধাজনক অবস্থায় আছে বাকিদের থেকে। তারারা অনেক বেশি সংখ্যায় এদের বানায়। সেই জন্যেই এদের এত রমরমা আমাদের আশেপাশে। তো এইভাবেই আজকের অবস্থার কারণ জানা যায় তারাদের মধ্যে কি ঘটছে সেটা দেখলে।

|| কিভাবে অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট হওয়া যায় ||

এবার বিজ্ঞান থেকে একটু বেরিয়ে এসে কিছু প্রশ্ন করি। ছোটবেলায় তো আমরা সকলেই তারা দেখতে খুব ভালবাসি। কিন্তু, ব্যক্তিগতভাবে তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করি, তারা দেখার মজা থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করবো, সেই জায়গাটাতে এলে কি করে?

আমার ছোটবেলায় তারা দেখতে ভালো লাগতো, তাদের সম্বন্ধে জানতেও ভালো লাগতো। কিন্তু এটা ভাবিনি যে জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করবো। জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে যে এখনো গবেষণা হয়, সেটাই আমি জানতাম না। কেউ বলেনি। আমি পদার্থবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করতে টাটা ইনস্টিটিউটে গেছিলাম। সেখানে দেখলাম: জ্যোতির্বিজ্ঞান বিভাগ আছে, সেখানে মজার মজার সব কাজ হয়।

তখন, প্রফেসর অলোক রায়ের সাথে কাজ করতে শুরু করলাম। সেই থেকে কাজ শুরু। তবে, আমি অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানিকেই চিনি যারা ছোটবেলা থেকেই জানতেন যে জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়েই কাজ করবেন।

আমাদের ইস্কুলের পাঠ্যক্রমে জ্যোতির্বিজ্ঞানের অংশটা তো প্রায় নেই বললেই চলে।

না, জ্যোতির্বিজ্ঞানের কিছু তো ছিলই না। আর ইস্কুলে সবকিছুই কিরকম নিরস ভাবে পড়ানো হতো, মুখস্থবিদ্যার উপর জোর দিয়ে। তাতে বিষয়গুলো পড়ে খুব একটা আনন্দ হতো না।

এই যে পদার্থবিদ্যা পড়বার ফন্দিটা করেছিলাম, সেটার কারণ হলো, তাতে অন্তত কিছুটা নিজে প্রশ্নের সমাধান করবার উপর জোর দেওয়া হতো। এমন নয় যে আমি মনে করি, পদার্থবিদ্যা সবথেকে ইন্টারেষ্টিং । খালি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় পদার্থবিদ্যার যে শিক্ষকদের আমি পেয়েছি, তাঁরা নিজে প্রবলেমের সমাধান করার উপর

জোর দিতেন। আর সেটা তাঁরা করতে পারতেন, কারণ বোর্ডের পরীক্ষায় সত্যিই সেইধরণের প্রশ্ন আসতো। তো, সেইভাবেই পদার্থবিদ্যা ভালো লেগেছিল।

আচ্ছা, এখন কেউ যদি ছোটবেলায় মনে করে যে সে ভবিষ্যতে জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করতে চায় এবং মনে করে সে নিজেকে আরেকটু ভালোভাবে প্রস্তুত করতে চায়, কি করতে পারে সে? পাঠ্যপুস্তকে তো সেসব পড়ানো হয়না।

প্রথম দরকারী বিষয় হলো অঙ্ক করতে পারা। অঙ্ক তো প্রায় সব স্কুলেই পড়ানো হয়। অনেকসময়, স্কুলে যেসব অঙ্ক শেখানো হয়, আমরা তার পিছনে কারণটা বুঝি না। কিন্তু পরে গিয়ে সেসব কাজে লাগে। বিশেষত, জ্যোতির্বিজ্ঞান বা শুধু পদার্থবিদ্যাতেও সেসব অঙ্ক ব্যবহারে লাগে।

কি জাতীয় অঙ্ক? একটু উদাহরণ দাও।

এই ধরো ক্যালকুলাস। এতে হঠাৎ করে আমাদের ডিফারেনশিয়াল সমীকরণ সমাধান করতে বলা হয়। তখন মনে হয়, এত জটিল জটিল ডিফারেনশিয়াল সমীকরণ সমাধান করে কি হবে?

কিন্তু, একটু আগে যে বললাম, তারাদের ভিতরের ঘনত্বের সাথে তারাদের গোটা ভরের একটা সম্পর্ক আছে, এটা একটা ডিফারেনশিয়াল সমীকরণ সমাধান করে পাওয়া যায়। সেই সমীকরণ টাকে বলে স্ট্রাকচার ইকুয়েশান। তারাদের এক একটা যে স্তর, পেঁয়াজের মত, সেই স্তর উপর নিচ দুদিক থেকে চাপ খাচ্ছে আর সেই চাপগুলো তাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। এই তথ্যটা থেকেই একটা ডিফারেনশিয়াল সমীকরণ তৈরী করা যায় এবং তাকে সমাধান করেই তারাদের গঠন সম্বন্ধে জানা যায়।

এবার ডিফারেনশিয়াল সমীকরণ না জানলে সেটা বোঝা বা তাকে সমাধান করা সম্ভব নয়। তাই অঙ্কটা ভালো করে শিখে রাখা একটা জরুরি পদক্ষেপ, পরে জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করার জন্য।

তাহলে ওই যে বললে কেন শিখছি সেই কারণটা অঙ্ক শেখার সময় বোঝা যায় না, এটার একটা সমাধান হতে পারে এইরকম: যখন অঙ্কটা শেখানো হচ্ছে, যদি একটা বাস্তব জীবনের সমস্যা, যেমন জ্যোতির্বিজ্ঞানের কোনো প্রশ্ন, তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা যায়, সেটা অনেক বেশি ইন্টারেষ্টিং হবে।

অনেক সময় সেটা করা খুব বেশি কঠিন নাও হতে পারে। অনেক পদ্ধতি, যেগুলো খুব নিরস লাগে, সেগুলো পরবর্তীকালে কোথায় ব্যবহার হবে সেটা যদি বোঝানো হয়, তাহলে হয়তো ছাত্রদের অত অনীহা হবে না সেগুলো শিখতে।

আচ্ছা অঙ্ক ছাড়া আর কি জানতে হবে?

তার পর পদার্থবিজ্ঞান। পদার্থবিজ্ঞানে আমরা যা শিখি, সেগুলো জ্যোতির্বিজ্ঞানেও খুব জরুরি।

এই যে আমি এক্স-রে পর্যবেক্ষণ করি, সেই এক্স-রে নানা প্রক্রিয়ায় তৈরী হয়। সেইসব প্রক্রিয়া – গরম গ্যাস থেকে ব্রেমস্ট্রাহলুং, বা পরমাণুর একটা শক্তি থেকে আরেকটা শক্তিতে যাওয়ার ফলে আলোর স্পেকট্রামে লাইন দেখতে পাওয়া, বা কম্পটন বিক্ষেপণ – এসব তো পদার্থবিদ্যাতেই শেখানো হয়।

তারপর আমরা যে জানি হাইড্রোজেনের লাইনগুলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত, সেটাও পদার্থবিদ্যার আওতায় পড়ে। আবার ডপলার এফেক্টের ফলে সেই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের থেকে আলাদা দৈর্ঘ্য যখন দেখি আর বুঝতে পারি যে আলোর উৎস কত গতিতে ছুটছে, সেটাও পদার্থবিদ্যার ক্লাসে শেখা।

আর একটা ইন্টারেষ্টিং ব্যাপার আছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানে পরিষ্কার এক্সপেরিমেন্ট করা সম্ভব নয়। সুপারনোভা থেকে আলো তো দেখা যায়। কিন্তু কেন দেখা যায়, অন্তত পাঁচ-সাত রকম প্রক্রিয়া তার পিছনে রয়েছে। সেগুলোকে তার ভিতর থেকে আলাদা আলাদা করতে গেলে প্রত্যেকটা প্রক্রিয়াকে আগে ভালো করে বুঝতে হবে। তার থেকে মডেল বানাতে পারতে হবে। সেই মডেলের থেকে কষতে পারতে হবে কিরম স্পেকট্রাম দেখা যায়। তারপর তুলনা করা যাবে বাস্তবে কি স্পেকট্রাম দেখা যাচ্ছে তার সাথে। অতএব একটা পরিষ্কার এক্সপেরিমেন্ট, যেখানে একটাই প্রক্রিয়া ঘটছে, সেটা সম্ভব নয়, কারণ এক্সপেরিমেন্টগুলো আমাদের হাতেই নেই।

সেইজন্যে, এক্সপেরিমেন্টের দিক থেকে প্রক্রিয়াগুলো আলাদা আলাদা ভাবে বুঝতে পদার্থবিজ্ঞানের ল্যাবরেটরিই হয়ত আদর্শ জায়গা। তারপর সেই ধারণাকে জ্যোতির্বিজ্ঞানে কাজে লাগানো যায়।

অবশ্যই, এমন কিছু জিনিস আছে যেগুলো ল্যাবরেটরিতে তৈরী করা যাবে না। যেমন, ল্যাবে যে প্লাসমা তৈরী করা যায়, সেটার তাপমাত্রা বা ঘনত্ব কি হবে, সেটা অনেক সময়ই সীমিত। তারার মধ্যে তার থেকে অনেক বেশি তাপমাত্রা বা ঘনত্বের প্লাসমা থাকে।

এই ধরণের কোনো অনলাইন জায়গা আছে যেখানে ধরো কোনো ক্লাস নাইন-টেনের ছাত্র গিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের জিনিসপত্রের সহজ ব্যাখ্যা পাবে?

হ্যাঁ, নিশ্চয় আছে।

যেমন, NASA-র যেমন খুব ভালো প্রচারব্যবস্থা আছে। ওদের প্রত্যেকটা মিশনের বাজেটে জায়গা রাখে প্রচারের জন্য। যেমন, "চন্দ্র"-র জন্য খুব দারুণ প্রচার হয়েছিল। "চন্দ্র" থেকে পাওয়া ফলাফল, যা অবৈজ্ঞানিকরাও বুঝতে পারবে, সেগুলো ওদের ওয়েবসাইটে ওরা ভালোভাবে ব্যাখ্যা করে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে আমাদের দেশে কি হাই স্কুলের পর সোজাসুজি পড়া যায়, না আগে পদার্থবিদ্যা নিয়ে পড়ে তারপর সেদিকে যেতে হয়?

আমাদের দেশে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট লেভেলে জ্যোতির্বিজ্ঞান পড়ানো হয় বলে তো আমার জানা নেই। বেশিরভাগ জ্যোতির্বিজ্ঞানী যাদের চিনি, তাঁরা আন্ডারগ্র্যাজুয়েট অবস্থায় হয় অঙ্ক নয় পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেছে। অনেকে ইঞ্জিনিয়ারিং ফিসিক্স, মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং, বা ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং, এইসব থেকেও জ্যোতির্বিজ্ঞানে আসে।

মাস্টার্স লেভেলে কি জ্যোতির্বিজ্ঞান পড়ানো হয়? আর হলে কোন কোন জায়গায়?

যেমন, কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে অ্যাস্ট্রোফিসিক্সে স্পেশালাইজেশান ওয়ালা একটা ফিসিক্সে মাস্টার্স অফার করা হয়। এরম আরো কিছু কিছু জায়গা আমাদের দেশে আছে, যেখানে মাস্টার্সটা পদার্থবিদ্যায় কিন্তু অ্যাস্ট্রোফিসিক্সে স্পেশাল পেপার আছে। মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়, পুনা বিশ্ববিদ্যালয়, বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এইসব জায়গাতে এগুলো আছে।

অ্যাস্ট্রোফিসিক্সে মাস্টার্সের পর কেউ গবেষণা করতে চাইলে, দেশের ভিতরে কোন কোন জায়গা ভালো?

অ্যাস্ট্রোফিসিক্সে গবেষণা করতে চাইলে পিএইচডি করা খুব জরুরি। ভারতে বেশ কিছু জায়গা আছে, যেখানে অ্যাস্ট্রোফিসিক্সে পিএইচডি অফার করে। টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সাইন্স, পুনা-র IUCAA এদের মধ্যে অন্যতম। বেঙ্গালুরুতে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোফিসিক্সও খুব নামকরা। তারপর বেঙ্গালুরুতে রামান রিসার্চ ইনস্টিটিউট, নৈনিতালে আর্যভট্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট, এগুলোতেও অ্যাস্ট্রোফিসিক্সে পিএইচডি হয়ে থাকে। এছাড়া অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ও অ্যাস্ট্রোফিসিক্সে পিএইচডি অফার করে।

চার রকমের গবেষণা অ্যাস্ট্রোফিসিক্সে খুব প্রচলিত। এক ধরণের গবেষক শুধু খাতা কলমে থিওরিটিকাল কাজ করে। তাঁরা পদার্থবিদ্যার নানা জিনিস, যা আমরা এখন বুঝি, সেগুলো ব্যবহার করে মহাকাশে কোনো ঘটনার ব্যাখ্যা বার করার চেষ্টা করে। এক ধরণের গবেষক দূরবীন দিয়ে মহাকাশে কি হচ্ছে, সেটা দেখার চেষ্টা করে। তারপর, এক ধরণের গবেষক সেই দূরবীনগুলো বানায়। আর আছে যারা সিমুলেশন করে। যেসমস্ত প্রশ্নের সমাধান খাতা কলমে করা যায়নি, সেগুলোকে খুব শক্তিশালী কম্পিউটারে সিমুলেশন চালিয়ে সেগুলোর উত্তর পাওয়ার চেষ্টা করে।

এই চারটে জিনিসেই অ্যাস্ট্রোফিসিক্সে পিএইচডি হয়?

এই চার ধরণের গবেষণার জন্যেই পিএইচডি দেওয়া হয়ে থাকে। অনেকে এর একাধিক মিলিয়েও পিএইচডি করে থাকে।

আমি যেমন খাতা কলমে সহজে করা যায়, এমন থিওরি করি কিছু। আবার যন্ত্রপাতি অন্যরা বানিয়ে রেখেছে, সেই দিয়ে কিছু পর্যবেক্ষণও করি।

পর্যবেক্ষণ করতে ভারতে কোথায় কোথায় বড় দূরবীন আছে?

এটার উত্তর ভালো করে দিতে হলে পৃথিবীর বাকি টেলিস্কোপের সাথে তুলনা করতে হবে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় টেলিস্কোপগুলোর একটা হলো GMRT বা জায়ান্ট মিটারওয়েভ রেডিও টেলিস্কোপ। যেটা পুনার কাছে এক জঙ্গলে আছে। রেডিও অ্যাস্ট্রোনমিতে ভারত খুবই এগিয়ে বেশিরভাগ দেশের তুলনায়।

এছাড়া, অপটিক্যাল টেলিস্কোপও আছে ভারতে তিন-চার জায়গায়। কিন্তু সেগুলো বাকি জায়গার তুলনায় অনেক ছোট। অপটিক্যাল অ্যাস্ট্রোনমিতে আমরা ততটা এগিয়ে নই।

কোথায় আছে অপটিক্যাল টেলিস্কোপ?

অপটিক্যাল টেলিস্কোপের জন্য উঁচু জায়গা খুব ভালো। ভারতের সবথেকে ভালো অপটিক্যাল টেলিস্কোপ লাদাখে। হানলে বলে এক জায়গায়, মাউন্ট সরস্বতী বলে এক পাহাড়ের উপরে। এটা চালায় ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোফিসিক্স।

IUCAA-র একটা টেলিস্কোপ আছে পুনার কাছে ওয়েস্টার্ন ঘাটসের উপরে। GMRT-র কাছেই।

GMRT-র জন্য অবশ্য উঁচু, শুকনো জায়গা লাগেনা, কারণ মেঘ ভেদ করে রেডিও তরঙ্গ আসতে পারে। রেডিও অ্যাস্ট্রোনমির জন্য যেটা অসুবিধে সৃষ্টি করে, সেটা হলো রেডিও ইন্টারফেরেন্স। ভারতের জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান। এবং সকলের হাতে মোবাইল ফোন। GMRT যে কম্পাঙ্কতে কাজ করে, ৯০০ MHz থেকে ১.৫ GHz অব্দি, সেটার মাঝে মোবাইলের ব্যান্ডগুলো ইন্টারফেয়ার করে। তবে, নতুন প্রজন্মের মোবাইলগুলো আশা করা যায় আরো উঁচু কম্পাঙ্কে চলে যাবে।

আচ্ছা, বেসিক সাইন্স অর্থাৎ প্রকৃতি কিভাবে কাজ করে সেই খোঁজের বাইরে অ্যাস্ট্রোফিসিক্সের আর কি কার্যকারিতা আছে? ধরো, গবেষণার পৃষ্ঠপোষকরা যদি এই প্রশ্ন করে তোমাকে।

নিশ্চয় আছে। অ্যাস্ট্রোফিসিক্সে আমরা যা দেখি, সেগুলো বেশ দূরের আর সেগুলো থেকে খুব কম আলো আসে। ওইটুকু আলোকে আমরা ধরতে পারি এবং তাই নিয়ে গবেষণা করতে পারি। শুধু তাই নয়, তার থেকে আলোর উৎস সম্বন্ধেও জানতে পারি। এটা করতে গিয়ে আমরা অনেকদূর এগিয়ে গেছি। যন্ত্রপাতি বানানো, তার থেকে পাওয়া তথ্য বোঝা, এসবে আমাদের যে দক্ষতা গড়ে উঠেছে সেটা নানা জিনিসে কাজে লাগে।

যেমন, অ্যাস্ট্রোফিসিক্সে যে ইমেজিং পদ্ধতি, সেগুলো অনেক সময়ই চিকিৎসার ক্ষেত্রে কাজে লাগে। অ্যাস্ট্রোফিসিক্সে যে রেডিও প্রযুক্তি ব্যবহার হয়, তার দরুণ মোবাইল ফোনের প্রচুর উন্নতি হয়েছে। যেমন, অস্ট্রেলিয়া রেডিও অ্যাস্ট্রোনমিতে খুব এগিয়ে। আমরা যে WiFi ব্যবহার করি, তার অনেকগুলো পেটেন্ট

অস্ট্রেলিয়ার CSIRO-র রেডিও অ্যাস্ট্রোনমি বিভাগ থেকে এসেছে। অর্থাৎ, তাঁরা সেই আবিষ্কারগুলো না করলে WiFi আসতো না।

আর, যেটা আগে বললাম, আমাদের আজকের মহাবিশ্ব কেন এইরকম, সেইটা বুঝতে পারি অ্যাস্ট্রোফিসিক্সের গবেষণার মাধ্যমে।

আচ্ছা, শেষ প্রশ্ন। এটা একটু বিতর্কিত ব্যাপার, তবু প্রশ্নটা করি। ভারতের অ্যাস্ট্রোফিসিক্সের ইতিহাস সম্পর্কে তোমার কি বক্তব্য? এইযে এককালে এত উন্নতির কথা আমরা শুনছি, তার মধ্যে কতটা মিথ আর কতটা সত্যি?

ভারতের যারা পুরনো জ্যোতির্বিজ্ঞানী, আর্যভট্টর সময়কার কথা বলছি, তাঁরা অনেকেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীও বটে, গণিতজ্ঞও বটে, আবার রাজজ্যোতিষও বটে। নানান ভূমিকা ছিল তাঁদের। তাঁরা সত্যি কতটা জানতেন বা জানতেন না, সেটা বোঝা সবসময় সোজা নয়। তাঁরা অনেকসময় হিসেব একরকম করতেন, তারপর বলার জন্য আরেকরকমভাবে বলতেন। তাঁরা কষে বার করতে পারতেন যে চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ কখন হবে কারণ তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন পৃথিবী কি চাঁদের ছায়ার জন্য এই গ্রহণগুলো হয়। কিন্তু জনসাধারণকে বোঝানোর সময় রাহু, কেতূ এসব বলতেন।

বর্তমান সরকারের ইতিহাস নিয়ে কাটাছেঁড়ার ওপর একটা ভালো লেখা লিখেছেন টাটা ইনস্টিটিউটের মায়াঙ্ক ভাহিয়া।

তাঁর বক্তব্যের সাথে আমি একমত। তিনি বলছেন, ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বা ভারতীয় গণিতজ্ঞরা হয়ত নানা আবিষ্কার করেছিলেন এবং পৃথিবীর ইতিহাসে সেইসব আবিষ্কার নিঃসন্দেহে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাঁরা সত্যিই কি করেছিলেন, তা নিয়ে অনেক কাজ হয়েছে, আরো অনেক কাজ প্রয়োজন। কিন্তু, সবই বেদে আছে, এইটা বলা এই কাজের জন্য ক্ষতিকর। কারণ যত এইরকম করা হবে, তত বর্তমান বিজ্ঞানীরা বা ইতিহাসবিদরা নিজেদের এই কাজের থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করবে। এইসব কাজে যারা নামবে, তাঁদের সেই শিক্ষা বা ট্রেনিং থাকবে না।

(হেসে) আমি এই বিষয়টা নিয়ে শুধু এটুকুই বলতে চাই। প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সত্যিই কি কি করেছিলেন, সেই নিয়ে আমাদের গবেষণা করা উচিত এবং তা নিয়ে গর্বিত হওয়া উচিত। তাঁরা কি করলে আমরা খুশি হতাম, সেই নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয়। সেটা এক অর্থে তাঁদের প্রতিভাকে অসম্মান করা।

এইখানেই আমাদের ইন্টারভিউ শেষ করা যাক। তোমাকে এখনকার মত রেহাই দিলাম। এই দেড় ঘন্টায় অনেক কিছু শিখে ফেললাম মনে হচ্ছে। আশা করছি, আমাদের পাঠকদেরও এই অনুভূতিটাই হবে।

লেখক পরিচিতি ('বিজ্ঞান'-এ প্রকাশিত হওয়ার সময়) :

সায়ন চক্রবর্তী হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জুনিয়র ফেলো। তার গবেষণার বিষয় অ্যাস্ট্রোফিসিক্স। টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ থেকে Ph.D.।

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন :

http://bigyan.org.in/2015/05/10/supernova/
http://bigyan.org.in/2015/05/16/detecting-supernova/
http://bigyan.org.in/2015/05/31/how-to-be-an-astrophysicist/

লেখাটি তিনটি পর্বে 'বিজ্ঞান'-এ প্রকাশিত হয়েছিল যথাক্রমে ১০ মে ২০১৫, ১৬ মে ২০১৫ ও ৩১ মে ২০১৫ তারিখে।

ছবির উৎস :

Wikipedia (Courtesy NASA/JPL-Caltech)

Chandra X-ray Observatory (via Wikimedia Commons)

লিসা মাইটনার : মানবতাবাদী এক পদার্থবিজ্ঞানী

সেরজিও পি. পেরেজ

"নিঃস্বার্থভাবে মানুষকে সত্য ও নিরপেক্ষতার কাছে পৌঁছে দেয় বিজ্ঞান; বিস্ময়ের সাথে শেখায় বাস্তবকে গ্রহণ করতে, স্বীকৃতি দিতে। একইসাথে, একজন প্রকৃত বিজ্ঞানীর মনে তার চারপাশের জগতের স্বাভাবিক গঠন এনে দিতে পারে এক গভীর সম্ভ্রম আর আনন্দের ছোঁয়া।" – লিসা মাইটনার

লিসা মাইটনার, বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানমহলে সম্ভবতঃ সবচেয়ে অবহেলিত নাম। গোটা জীবনটাই তাঁর কেটেছে চরম লিঙ্গবৈষম্য, অবিচার ও বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে লড়াই করে। প্রকৃতপক্ষে, নিউক্লিয়ার পদার্থবিদ্যার জগতে গভীর জ্ঞান আহরণের প্রবল আকাঙ্ক্ষাই তাঁকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। সমস্ত প্রতিকূলতাকে পিছনে ফেলে রেখে তিনি নিজের যোগ্য জায়গা করে নিয়েছিলেন পুরুষপ্রধান বিজ্ঞান জগতে। ১৯৩৮ সালে নিউক্লিয়ার ফিশন আবিষ্কার করে তিনি বিজ্ঞানজগতে অমরত্ব লাভ করেছিলেন। কাজের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন ঠিকই, তবে জীবনসীমার একদম শেষে।

লিসা মাইটনারের জন্ম ১৮৭৮ সালের ৭-ই নভেম্বর, অস্ট্রিয়ার এক ইহুদী পরিবারে। পরবর্তীকালে এই ইহুদী হওয়ার জন্যই তিনি বাধ্য হয়েছিলেন হিটলারের একনায়কতন্ত্রে জর্জরিত জার্মানি ছেড়ে পালাতে। পদার্থবিদ্যা নিয়ে তাঁর পড়াশুনা শুরু হয় ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পরবর্তীকালে (১৯০৫) পদার্থবিদ্যায় ডক্টরেট উপাধিও লাভ করেন ওই একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তিনি ছিলেন ভিয়েনা

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট অর্জন করা দ্বিতীয় মহিলা বিজ্ঞানী।

এরপর লিসা সিদ্ধান্ত নিলেন বার্লিন যাওয়ার, স্বয়ং ম্যাক্স প্লাঙ্কের কাছ থেকে সম্মতি পেয়েছিলেন ক্লাসঘরে বসে তাঁর (প্লাঙ্কের) বক্তৃতা শোনার। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে এ এক অভাবনীয় ঘটনা। কারণ তার আগে পর্যন্ত সমস্ত মহিলার আবেদনপত্র খারিজ করে দিয়েছিলেন ম্যাক্স প্লাঙ্ক। বার্লিনে লিসা অটো হানের সাথে কাজ শুরু করেন। পরবর্তীকালে এই অটো হান-ই হয়ে ওঠেন তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধু। একদিকে লিসা গবেষণা করতেন তেজস্ক্রিয় পদার্থের পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে আর অন্যদিকে সেই সব পদার্থের রাসায়নিক ধর্ম নিয়ে মেতে থাকতেন অটো হান।

তিরিশ বছরেরও বেশি অটো এবং লিসা একজোট হয়ে কাজ করেছিলেন। দু'জনের মধ্যে তৈরি হয়েছিল এক প্রগাঢ় বন্ধুত্বের সম্পর্ক। কিন্তু দু'জনের চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। লিসা অতিমাত্রায় লাজুক আর অটো ছিলেন অতি সপ্রতিভ। তাঁরা একসাথে কাজ করেছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের দুজনের জন্য পরিস্থিতিটা মোটেই এক ছিল না। সে এক প্রকট লিঙ্গ বৈষম্যের সময়। গোড়ার কয়েকটা বছর লিসা তো তাঁর পারিশ্রমিকই পেতেন না, পরে যাও বা পেতেন তা ছিল অটো হানের পারিশ্রমিকের তুলনায় নিতান্তই সামান্য। তবে তাঁদের যৌথ প্রয়াস বিজ্ঞানের জগতে এনে দেয় দারুন কিছু ফলাফল, যেমন – ১৯১৮-এ প্রোট্যাক্টিনিয়াম নামে নতুন মৌলের আবিষ্কার। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হলো ১৯৩৮ সালে নিউক্লিয়ার ফিশন-এর আবিষ্কার।

"লিসা হলেন আমাদের জার্মানীর মেরি ক্যুরি।" – অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

১৯৩৩ সাল নাগাদ বার্লিনে বসবাসকালে ইহুদী জন্মপরিচয়ের কারণে লিসাকে বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তখন তিনি বার্লিনের কায়সার উইলহেম ইনস্টিটিউট ফর কেমিস্ট্রী-র পরিচালিকা এবং একই সাথে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের পূর্ণ দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন অধ্যাপিকা। সেই বছরেই, শিক্ষাজগতের সাথে জড়িত সমস্ত

ল্যাবরেটরিতে কর্মরত অটো এবং লিসা

ইহুদীদের আইন মোতাবেক বাধ্য করা হয়েছিল তাদের পদ ছেড়ে দিতে।

স্বাভাবিকভাবেই লিসার গায়েও তার আঁচ লাগে। আইনস্টাইন, বর্নের (Max Born) মতো বিজ্ঞানীরা দেশত্যাগ করলেও লিসা দেশে থেকেই তাঁর

গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নেন। যদিও পরবর্তীকালে এই সিদ্ধান্তের জন্য তাঁকে অনুতপ্ত হতে হয়েছিল। ১৯৪৬ সালে তিনি বলেন, "সেই মুহূর্তে দেশত্যাগ না করার সিদ্ধান্তটা শুধু বোকামিই ছিল না, ছিল একটা বড় ভুল"। অবশেষে

১৯২১ সালে জার্মান বিজ্ঞানীদের বৈঠক, বাঁ দিক থেকে পঞ্চম লিসা।
ছবির উৎস - http://www.wereldoorlog1418.nl/wetenschap/

১৯৩৮ সালে নিজের ভয়ঙ্কর ক্ষতির শাসানি তাঁকে বাধ্য করে দেশ ছাড়তে। নিজের পরবর্তী বাসস্থান হিসেবে তিনি বেছে নেন স্টকহোমকে। কিছু ডাচ সহকর্মী বিজ্ঞানীদের সহায়তায়, শূন্য হাতে, ভয়ানক ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় লিসা জার্মানী ছেড়ে চলে যান। স্টকহোমে অত্যন্ত উদাসীন আপ্যায়নে তিনি ভীষণরকমের অপ্রস্তুত হয়েছিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ এই সময় কর্মসূত্রে বিজ্ঞানী নীলস বোরের সাথে তাঁর পরিচয় হয়, বোর-এর তখন কোপেনহাগেন থেকে সুইডেন নিয়মিত যাতায়াত ছিল।

বিজ্ঞানের ইতিহাস ঘাঁটলে আমরা দেখতে পাব, ১৯৩২ সালে নিউট্রন কণার অস্তিত্ব প্রমাণ করেন বিজ্ঞানী জেম্স চ্যাডউইক। ফলে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ধারা যায় বদলে, যেমন – ১৯৩৪ সালে বিজ্ঞানী ফার্মি নিউট্রন কণার সংঘর্ষ ঘটিয়ে সক্ষম হন সমস্থানিক (isotope) তেজস্ক্রিয় পদার্থসমূহের উৎপাদনে। অকস্মাৎ এই নতুন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ধরণ চালু হয়ে যায় এবং কার্যতঃ সমস্ত পরীক্ষাগারেই তখন একই ধরনের পরীক্ষা চালানো হতে থাকে। ১৯৩৮ সালে নির্বাসিতা লিসা, বিজ্ঞানী বোরের উপস্থিতিতে কোপেনহাগেনে তাঁর বন্ধু অটো হানের সাথে দেখা করার সিদ্ধান্ত নেন। লিসার পরামর্শ অনুযায়ী অটো ও তাঁর দল ইউরেনিয়াম পরমাণুর সাথে নিউট্রন কণার কৃত্রিম সংঘর্ষ ঘটিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু করেন এবং শুরুতেই পেয়ে যান চমকপ্রদ ফলাফল। পরীক্ষার ফলে উৎপন্ন হয়েছিল বেরিয়াম ও ক্রিপটন, কিন্তু মোট ভর আশ্চর্যজনকভাবে কমে যায় এবং

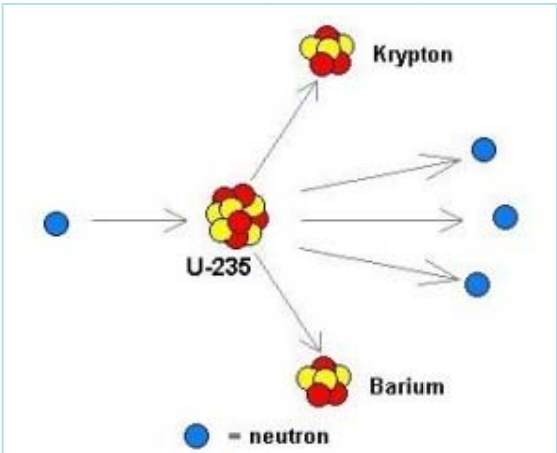

ফিশন প্রক্রিয়া

একইসাথে উৎপাদিত হয় বিপুল পরিমান শক্তি। কিন্তু তা কী ভাবে সম্ভব? এই হেঁয়ালির সমাধান খুঁজতে অটোর আবার প্রয়োজন পড়ল লিসার প্রখর বুদ্ধিমত্তা এবং পদার্থবিজ্ঞানের জ্ঞান।

সেইসময়ে নিজের ভাগ্নে অটো ফ্রিশের সাথে কর্মরত লিসা তৎক্ষণাৎ এই ঘটনার পেছনের কারণ খোঁজা শুরু করেন এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পুরো ব্যাপারটা তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। ভোজবাজির মতো উধাও হয়ে যাওয়া ভর, রূপান্তরিত হয়েছে শক্তিতে – যা ছিল ১৯০৫ সালে বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের ভবিষ্যৎবাণী! $E=mc^2$ সমীকরণটি পরীক্ষার ফলাফলের সাথে সম্পূর্ণরূপে মিলে যায়। সেই ছিল সূত্রপাত, যা আজ "নিউক্লিয়ার ফিশন" নামে পরিচিত।

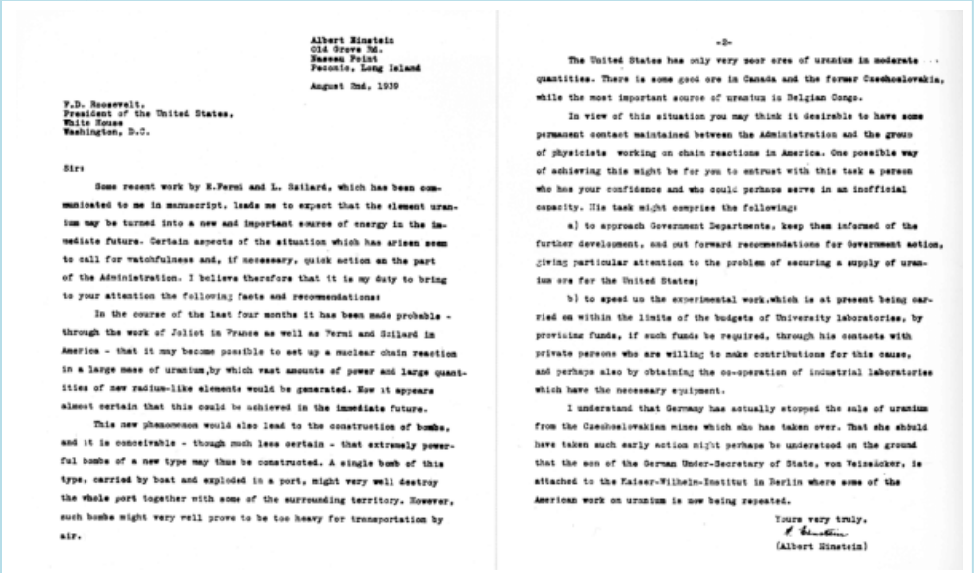

Albert Einstein
Old Grove Rd.
Nassau Point
Peconic, Long Island

August 2nd, 1939

F.D. Roosevelt,
President of the United States,
White House
Washington, D.C.

Sir:

Some recent work by E.Fermi and L. Szilard, which has been communicated to me in manuscript, leads me to expect that the element uranium may be turned into a new and important source of energy in the immediate future. Certain aspects of the situation which has arisen seem to call for watchfulness and, if necessary, quick action on the part of the Administration. I believe therefore that it is my duty to bring to your attention the following facts and recommendations:

In the course of the last four months it has been made probable - through the work of Joliot in France as well as Fermi and Szilard in America - that it may become possible to set up a nuclear chain reaction in a large mass of uranium,by which vast amounts of power and large quantities of new radium-like elements would be generated. Now it appears almost certain that this could be achieved in the immediate future.

This new phenomenon would also lead to the construction of bombs, and it is conceivable - though much less certain - that extremely powerful bombs of a new type may thus be constructed. A single bomb of this type, carried by boat and exploded in a port, might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. However, such bombs might very well prove to be too heavy for transportation by air.

-2-

The United States has only very poor ores of uranium in moderate quantities. There is some good ore in Canada and the former Czechoslovakia, while the most important source of uranium is Belgian Congo.

In view of this situation you may think it desirable to have some permanent contact maintained between the Administration and the group of physicists working on chain reactions in America. One possible way of achieving this might be for you to entrust with this task a person who has your confidence and who could perhaps serve in an unofficial capacity. His task might comprise the following:

a) to approach Government Departments, keep them informed of the further development, and put forward recommendations for Government action, giving particular attention to the problem of securing a supply of uranium ore for the United States;

b) to speed up the experimental work,which is at present being carried on within the limits of the budgets of University laboratories, by providing funds, if such funds be required, through his contacts with private persons who are willing to make contributions for this cause, and perhaps also by obtaining the co-operation of industrial laboratories which have the necessary equipment.

I understand that Germany has actually stopped the sale of uranium from the Czechoslovakian mines which she has taken over. That she should have taken such early action might perhaps be understood on the ground that the son of the German Under-Secretary of State, von Weizsäcker, is attached to the Kaiser-Wilhelm-Institut in Berlin where some of the American work on uranium is now being repeated.

Yours very truly,

(Albert Einstein)

১৯৩৯ সালে রুজভেল্টকে লেখা আইনস্টাইনের চিঠি

"নিউক্লিয়ার ফিশনের আবিষ্কারের আগে কেউই ভাবেনি নিউক্লিয়ার ফিশনের কথা।" – লিসা মাইটনার

এই অবিশ্বাস্য অন্তর্দৃষ্টি সত্ত্বেও এবং সন্দেহাতীত ব্যাখ্যা দিয়েও বঞ্চিত হন লিসা। ১৯৪৪ সালে সহকর্মী অটো হানকে নোবেল পুরষ্কারে ভূষিত করা হলেও অনুচ্চারিত থেকে যায় লিসার নাম।

তাঁর নির্বাসন এবং বার্লিনে গবেষকদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে এই তত্ত্ব উদ্ভাবনে লিসার প্রধান ভূমিকার কথা বুঝতে পারেননি নোবেল পুরষ্কারদাতারা। নোবেল পুরষ্কারের ইতিহাসে এই বড় ভুলকে চিহ্নিত করা হয় "নোবেল মিসটেক" হিসেবে। নোবেল পুরষ্কার থেকে বঞ্চিত হলেও অন্যান্য অনেক পুরষ্কার তিনি পেয়েছিলেন যাতে তাঁকে এই কাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে উঁচুমানের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিলো। যেমন – ১৯৬৬ সালে অটো, লিসা এবং স্ট্রাসম্যানকে (অটোর দলের আর একজন সদস্য) যৌথভাবে 'ফার্মি পুরষ্কার' দেওয়া হয়।

একভাবে বলা যায়, নিউক্লিয়ার ফিশনের এই আবিষ্কারই পরবর্তীকালে নিউক্লিয়ার (পারমাণবিক) আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির পথ খুলে দেয়। বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন, অটো হান আর তাঁর দলের করা কাজের পদ্ধতিতেই শৃঙ্খলা বিক্রিয়া (চেইন রিয়্যাকশন)-কে কাজে লাগিয়ে উৎপন্ন করা যেতে পারে বিপুল

পরিমাণ শক্তি। জার্মানী যদি এই তত্ত্ব কাজে লাগিয়ে পারমাণবিক বোমা বানাতে সক্ষম হয় তাহলে তাদের সেই অগ্রগতি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রকাশ পেতে পারে – ১৯৩৯ সালে লিও সিলার্ড দ্বারা প্ররোচিত হয়ে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন এই ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্টকে সতর্ক করার সিদ্ধান্ত নেন। যার ফলস্বরূপ ১৯৪২ সালে ম্যানহাটন প্রকল্প প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রকল্পে যোগদানের প্রস্তাবে লিসার স্বতঃস্ফূর্ত উত্তর ছিল: "বোমা নিয়ে আমার কোনো কিছু করার নেই!"

"আমি যদি জানতাম যে জার্মানরা আদৌ একটি পারমাণবিক বোমা তৈরিতে সফল হবে না, তবে আমি কিছুই করতাম না।" -অ্যালবার্ট আইনস্টাইন (১৯৪৭ সালে রুজভেল্টকে লেখা চিঠিতে)

এরপর বাকি জীবনটা লিসা কাটিয়েছেন যুদ্ধের বিপক্ষে সংগ্রাম আর বিজ্ঞান প্রচার করে। অবশেষে তিনি কেমব্রিজে গিয়ে অবসর নেন এবং সেখানেই ১৯৬৮ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর সমাধিপ্রস্তরে তাঁর উদ্দেশ্যে ভাগ্নে অটো ফ্রিশের লেখা শব্দগুলি আজও পড়া যায়: "লিসা মাইটনার: এক পদার্থবিজ্ঞানী যিনি কখনো তাঁর মনুষ্যত্ব হারান নি।" ১৯৯৭ সালে তাঁকে সম্মান জানিয়ে তাঁর নামানুসারে মৌল ১০৯ এর নাম দেওয়া হয় মাইটনারিয়াম (Mt)।

লেখকের প্রতিক্রিয়া: আমি মনে করি, যে পরিমাণ প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে সারাজীবন লিসাকে যেতে হয়েছে, তাতে অধিকাংশ মানুষই লড়াই করা ছেড়ে দিতেন। তাঁর একমাত্র সম্বল ছিল পদার্থবিজ্ঞান আর সেই জগতে তিনি নিজের প্রয়োজনীয় সমস্ত আনন্দ খুঁজে নিতেন। এই সাধনার জায়গা থেকেই অটো হানের সাথে কাজ করার প্রথম কয়েক বছর তিনি পারিশ্রমিক না পাওয়া সত্ত্বেও কাজ করা থামাননি অথবা পরবর্তীকালে স্টকহোমে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব তাঁকে তাঁর কাজ থেকে বিরত করতে পারে নি। তিনি এই সমস্ত বাধা একে একে পেরিয়ে এসেছিলেন। বন্ধু অটো তাঁর সাথে খানিকটা হলেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন, তা সত্ত্বেও জীবিতাবস্থায় তাঁরা বরাবর বন্ধু ছিলেন এবং তাঁদের এই জুটি ইতিহাসের পাতায় সফল জুটিগুলির মধ্যে অন্যতম, নিঃসন্দেহে । কিছু কিছু সূত্র থেকে গুজব রটে, সম্ভবতঃ তাঁদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল, কিন্তু লিসা নিজে বারংবার বলেছেন, তাঁর সমস্ত ভালোবাসা ছিল তাঁর গবেষণার প্রতি আর সেই কারণেই তিনি সময় পাননি বিয়ে বা সংসার করার। লিসা সেই বিজ্ঞানীদের মধ্যে একজন যারা সেই অর্থে সুপরিচিত না হলেও,বর্তমান সমাজকে গড়ে তোলার পিছনে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য।

লেখাটি প্রথমে
https://diaryofascientist.wordpress.com/ -এ প্রকাশিত হয়েছিল। মূল ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন শ্রীনন্দা ঘোষ।

লেখার সূত্র:

[১] কেমিকাল হেরিটেজ ফাউন্ডেশন-এর প্রবন্ধ
https://www.chemheritage.org/historical-profile/otto-hahn-lise-meitner-and-fritz-strassmann

[২] ওয়াশিংটন পোস্ট-এ লিসা-র জীবনী
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/style/longterm/books/chap1/lisemeitner.htm

[৩] স্প্যানিশ ভাষায় অনলাইন এনসাইক্লোপিডিয়াতে লিসা-র জীবনী
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/meitner.htm

[৪] সান দিয়েগো সুপারকম্পিউটার সেন্টারের ওয়েবসাইটে লিসা-র জীবনী
http://www.sdsc.edu/ScienceWomen/meitner.html

[৫] লিসা-র কিছু কোটেশন
http://todayinsci.com/M/Meitner_Lise/MeitnerLise-Quotations.htm

[৬] অটো ফ্রিস-এর জীবনী
http://www.atomicarchive.com/Bios/Frisch.shtml

[৭] E=mc2: Einstein's Big Idea (অংশবিশেষ লিসাকে নিয়ে)
http://www.infocobuild.com/books-and-films/science/energy-mass.html

লেখক পরিচিতি ('বিজ্ঞান'-এ প্রকাশিত হওয়ার সময়) :

মূল প্রবন্ধটির লেখক হলেন সেরজিও পি. পেরেজ। তিনি ইম্পেরিয়াল কলেজ অফ লন্ডনে (সেন্টার ফর ডক্টরাল ট্রেনিং ইন ফ্লুইড ডায়নামিক্স অ্যাক্রস স্কেলস) গবেষক।

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন
http://bigyan.org.in/2016/12/05/lise-meitner/

লেখাটি 'বিজ্ঞান'-এ ৫ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল ।

লেখা দিতে হলে

বৈদ্যুতিন লোকবিজ্ঞান (Popular Science) পত্রিকা বিজ্ঞান (http://bigyan.org.in)-এর বিভিন্ন বিভাগগুলিতে বিষয়ভিত্তিক লেখার জন্য আমরা সকলকেই আমন্ত্রণ জানাই।

বিজ্ঞান-এ লেখা পাঠানোর আগে লেখক অবশ্যই রচনার নিয়মাবলীটি পড়ে দেখুন।

আমরা যে ধরণের লেখা পেতে আগ্রহী

- বিজ্ঞানের (ব্যাপক অর্থে – গণিত ইত্যাদি সহ) কোন ধারণা বা concept-এর সহজ এবং অভিনব ব্যাখ্যা। যা সহজে পাঠ্য পুস্তকে পাওয়া যায় না অথবা অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তকে ভালভাবে বর্ণনা করা থাকে না। লেখকদের কাছে অনুরোধ আপনারা সাধারণ রচনাধর্মী লেখা পাঠাবেন না।
- কোন উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানীর জীবনের কিছু ঘটনা, যা পড়ে তাঁর গবেষণা ও তার পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে কিছু জানতে পারি। উইকিপিডিয়ার রচনামূলক ধাঁচের বদলে, কোন বিজ্ঞানীর বৈজ্ঞানিক অবদান এবং সেই আবিষ্কারের তাৎপর্যের উপর সংক্ষিপ্ত লেখাগুলো সাধারণত সুপাঠ্য ও আকর্ষণীয় হয়।
- কোন গবেষণার বিষয়ের বর্ণনা যা পাঠককে সেই বিষয়ে আরো জানতে অনুপ্রাণিত করবে। এক্ষেত্রে খুব বেশী টেকনিক্যাল টার্ম না ব্যবহার করা বিধেয়।
- নিজে কর – সহজে বাড়িতে বা স্কুলে তৈরী করা যেতে পারে বা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে এমন কোন বিষয়!
- বিজ্ঞানের কোন বিশেষ সমস্যা, যা বহুদিন ধরে বিজ্ঞানীদের ভাবাচ্ছে/ভাবিয়েছে তার বর্ণনা।
- বিজ্ঞানের খবর বা বিজ্ঞানের কোন বিষয় যা বর্তমানে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক, যেমন জলবায়ুর পরিবর্তন ইত্যাদি। এইধরণের বিষয়ে নতুন কোন আবিষ্কার বা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি কাম্য। কেবল মাত্র সমস্যার সাধারণ বর্ণনা যা উইকিপিডিয়ায় পাওয়া যাবে তা নয়।
- বিজ্ঞান বা অঙ্কের মজার ধাঁধা।

কিছু নিয়মকানুন

- লেখাটি বিজ্ঞানভিত্তিক হতে হবে। মেটাফিজিক্স জাতীয় লেখা পেতে আগ্রহী নই আমরা।
- লেখাটিকে এক হাজার শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখুন। তবে লেখার বিষয়বস্তুর উপযুক্ত ব্যাখ্যার প্রয়োজনে এর থেকে বড় লেখা লিখতে হলে সম্পাদকদের সাথে লেখা জমা দেওয়ার আগে আলোচনা করে নিন (bigyan.org.in-at-gmail-dot-com)।
- রাজনৈতিক বা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সমালোচনামূলক লেখা দয়া করে পাঠাবেন না।
- সম্পাদক মণ্ডলীর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবাচিত হবে।
- লেখাতে যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক তথ্যের উৎস উল্লেখ করার অনুরোধ জানাচ্ছি। এছাড়াও লেখার শেষে প্রাসঙ্গিক কিছু লেখা বা ভিডিও-র লিঙ্ক দিলে কৌতূহলী পাঠকের উপকারে আসবে।

লেখার খুঁটিনাটি

- প্রতিটি লেখা বাংলা হরফে (Unicode) Google doc ফাইল হিসেবে ই-মেল-এ জুড়ে পাঠাতে হবে। ছবির ক্ষেত্রে best possible resolution-এ পাঠাতে হবে।
- ই-মেল-এ বিষয় এবং কোন বিভাগের জন্য লেখা পাঠাচ্ছেন তা উল্লেখ করুন। সেই সাথে আপনার সম্পূর্ণ নাম এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানান।
- ই-মেল করুন bigyan.org.in@gmail.com-এ।